দ্বিখণ্ডিত ভালোবাসা

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

দিনলিপি-১১৭১
(০৭-০১-১৮)
দ্বিখণ্ডিত ভালোবাসা (১)!
-
আস্তে আস্তে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল, সর্পিল গতিতে। অন্ধকারের কোলে হারিয়ে গেল। আকাশে চাঁদ আছে, তবে জোছনার আভা কমে এসেছে। স্টেশনে আর কেউ নেই। এত রাতে কেউ থাকার কথাও নয়। একাই নেমেছি। পুরো বগিতে আমি ছাড়া আরও কিছু যাত্রী ছিল। ধারনা ছিল এ-বগি থেকে না হলেও অন্য বগি থেকে কেউ না কেউ নামবে। তার সাথে কথা বলে রওয়ানা হতে পারব। কেউ নামেনি। এটা শেষ ট্রেন। স্টেশন মাস্টারের ঘরে মিটমিটে কুপি জ্বলছে। বিদ্যুত নেই। তার সাথে কথা বলে লাভ নেই, এত গহীন গাঁওয়ের হদিস জানার কথা নয়।
আজ কত বছর পর এই মাটিতে পা রাখলাম? দশ নাকি পনের? থাক, হিশেব-নিকেশে পরে বসা যাবে! আপাতত বাড়ির পথে রওয়ানা হওয়া যাক। যেতে হবে বহূদূর! পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ফুরিয়ে যাবে! আচ্ছা, বাড়ি গিয়ে কাউকেই যদি না পাই? দাদা-দাদু কি বেঁচে আছেন? প্রতিমা? বহরমপুর থেকে তার বড়ভাই এসে কি তাকে নিয়ে গেছে? সে কেমন আছে? কোথায় আছে? এতদিনে সে নিশ্চয়ই বেশ গিন্নিবান্নি হয়ে গেছে। সে কি এখন ছোটবেলার মতো পান খায়? টুকটুকে লাল করে? যাহ, কী সব আবোল তাবোল ভাবছি।
.
চাঁদ ডুবে গেলেও আলো রয়ে গেছে। পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। একটা বিষয় বেশ অবাক লাগে, জীবন থেকে মানুষ হারিয়ে গেলেও, হারিয়ে যাওয়া মানুষটার সাথে চলা পথগুলো হারায় না। সামান্য রূপবদল হলেও আগের মতোই থেকে যায়। জীবন দিনদিন ক্ষয়ে এলেও পথ দিনদিন সুন্দর আর বিস্তৃত হয়। কাঁচা থেকে ইটের হয়। ইটের থেকে পিচঢালা হয়। দু'পাশে বৃক্ষরোপণ হয়। ঘরবাড়ি ওঠে। দোকানপাট গজায়। অবশ্য জীবনেও সমৃদ্ধি আসে। ছেলেমেয়ে-নাতিনাতকুরে সংসারের দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে। প্রত্যন্ত অজগাঁ বলেই বোধ হয়, দীর্ঘদিন পরও পথটা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। সময়ের পরিক্রমায় জীবনের মতো এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। এ-পথ ধরে, রাতের ট্রেনে কতবার আব্বুর সাথে গ্রামের বাড়িতে এসেছি! একেবারে ছোট থেকে বড়বেলা পর্যন্ত। পথটা কিন্তু রয়ে গেছে, নেই শুধু........!!!
.

রাতের ট্রেনগুলোতে যেন রহস্য লুকিয়ে থাকে। চারপাশে কী যেন একটা কিছু অধরা থেকে যায়। ট্রেন থেকে নামার পর, রহস্যটা আরও ঘনীভূত হয়। আব্বুর হাত ধরে থাকলেও কেমন যেন গা ছমছম করত। মনে হত, এই বুঝি কেউ একজন এসে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। ছেলেবেলার এই ভয়, বড় হয়েও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমরা যখন সীমান্ত পেরিয়ে আফগানে প্রবেশ করছিলাম, তখন পথের এক জায়গায় গিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। সে পথটাও ছিল হুবহু আমাদের এই পথটার মত। সহযাত্রী জর্দানি ভাইকে বলেছিলাম,
-আখী, আমার হাতটুকু ধরো, আমার না ভীষণ ভয় করছে!
আমি সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছি দেখে, ভাইটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ার উপক্রম। তার হাসি দেখে আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। এমন নির্জন রাতে এভাবে কেউ হাসে? আমরা এখন লাইন অব ফায়ারে আছি। যে কোনও মুহূর্তে সোভিয়েত ক্লাশিনকভ গর্জে উঠতে পারে।
আমি লাহোর থেকে এলেও, জর্দানি ভাই আগে থেকেই পেশোয়ারে ছিলেন। ড. আযযাম (রহ.) আমাকে তার সাথে জামাতবন্দী করে দিয়েছেন। যেতে হবে জালালাবাদে, আবু হামযা (ছদ্মনাম, যিনি পরবর্তীতে একটা ঘটনার কারণে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে যাবেন)-এর কাছে। ভাগ্যটা ভালো ছিল, আবদুর রাহমান ফারুকী (রহ.) ভাইও কী ভেবে আমাকে বাঙালিদের সাথে না রেখে, আরবদের সাথে থাকতে বলেছিলেন। মানুষটা হাকীম ছিলেন। কত কী যে শিখেছি! সারা বিশ্ব থেকে ছুটে আসা, এত এত গুণী মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া, চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! একেক জনের সে কি যোগ্যতা! ইংরেজী জানাতে অন্যদের তুলনায় আমার একটু বেশিই সুবিধা হয়েছে। অনায়াসেই কমিউনিকেট করা গেছে। সবার কাছ থেকে সেরা শিক্ষাটা বের করে আনতে পেরেছি। মন খুলে কথা বলতে পেরেছি।

.

এসব পরে হবে। এখন গ্রামে ফিরে আসি। স্বাধীনতার আগে আমাদের স্টেশনটা আরও জমজমাট ছিল। এতদিন পরও কেন যে এটার উন্নতি হল না, বলা মুশকিল। আব্বুর সাথে স্বাধীনতার আগে যখনই আসতাম, যত রাতেই নামতাম, মানুষ থাকত। কেউ কেউ এগিয়েও দিতে চাইত। আব্বু নিষেধ করতেন। লোকজন আমাদেরকে এত সমাদর করতেন, দাদার কারণে। আশেপাশে কয়েকটা গ্রামে এমন কোনও ছাত্র নেই, যাকে দাদা ইংরেজি-অংক-বিজ্ঞান শেখাননি। দাদাভাই ছিলেন আমাদের গ্রামের হাইস্কুলের অংকশিক্ষক। তার সাবজেক্ট অংক হলেও তিনি বিজ্ঞান পড়াতেন। শিক্ষকসংকটকালে

ইংরেজীও পড়াতেন। আর ফাঁকা থাকলে, মৌলভী স্যার দাদাকেই ঠেলে পাঠাতেন, ধর্মক্লাসে। দাদাও সানন্দে রাজি হয়ে যেতেন। মজার ব্যাপার হল, দাদা হিন্দুধর্মের ক্লাশও নিয়েছেন। গ্রামের স্কুল, বিষয়ভিত্তিক আলাদা শিক্ষকের বন্দোবস্ত থাকত না। ভাল শিক্ষক এলেও, কিছুদিন থাকার পর, ভাল জায়গায় পোস্টিং নিয়ে বদলী হয়ে যেতেন।

.

জানি না আজ বাড়ি গিয়ে দাদাকে দেখতে পাবো কি না! দাদীকে কি দেখতে পাবো? বাবা-মা হারা এতিমের জন্যে কি কেউ অপেক্ষা করে থাকে? রুবাবাকে খোঁজা ও পড়ার জন্যে লাহোরে যাওয়ার পরও দাদার সাথে পত্র যোগাযোগ ছিল, আফগান সীমান্ত পেরুনোর পর আর যোগাযোগ হয়নি। মন বলছে তিনি বেঁচে আছেন। রাব্বে কারীম যেন তাই করেন।

.

দাদাকে দেখে মনেই হত না, তিনি একজন স্কুলশিক্ষক। আগে গ্রামবাঙলার মানুষের উপর ফুরফুরা-জৌনপুরী পীরের প্রভাব ছিল। দাদা জৌনপুরী তরীকার মুরীদ ছিলেন। আমলে আখলাকে নিজেও পীরের মতো ছিলেন। সে সুবাদে আব্বুকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়েছেন। পীরের তরীকা অনুযায়ী দাদার মধ্যে কিছু বেদাতী আমল ছিল। আব্বু আস্তে আস্তে দাদাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সেসব থেকে ফিরিয়েছেন। তারপর থেকে গ্রামে মিলাদ কেয়াম বন্ধ।

.

আমাদের গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। অন্য জায়গার মতো, একদিকে হিন্দু, আরেকদিকে মুসলমান এমন নয়। উভয় সম্প্রদায়ই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। তাই উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জানাশোনা আনাগোনা ছিল। দাদার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিষয়টা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আব্বু এতটা মাখামাখি পছন্দ করতেন না। তিনি দাদাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন,
-তারা যত ভালো প্রতিবেশিই হোক, আখের তারা মূর্তিপূজারী। মুশরিক। শিরকের কারণে তারা ঘৃণিত।
-আরে বেটা, শিরককে আমিও ঘৃণা করি রে! আমি সুযোগ পেলেই তাদেরকে বোঝাই!
-কই, মূর্তিপূজা বন্ধ হয়েছে?
-না, তা হয়নি। কিন্তু কিছু মানুষের মনে সংশয় তৈরী করতে পেরেছি। এটাও কম নয়। তারা মুসলমানদেরকে ভালোবাসে। তুমি খেয়াল করলে দেখবে, আমাদের গাঁয়ের বেশির ভাগ হিন্দু ইসলাম ধর্মকে তাদের ধর্মের তুলনায় সেরা মনে করে। এটা কম কিসে! বলা যায় না, একসময় হেদায়াত পেয়েও যেতে পারে।

.
দাদা ছিলেন জাতশিক্ষক। স্কুলে তো পড়াতেনই সন্ধ্যার পর বাড়িতেও পড়াতেন। সকালেও আশেপাশের ছাত্রদেরকে পড়ার জন্যে আসতে বাধ্য করতেন। দূরের ছাত্রদের জন্যে আশেপাশে জায়গীরের ব্যবস্থা করে দিতেন। হিন্দুদেরকে হিন্দু ঘরে দিতেন। গরীব হলে, ধর্মমত নির্বিশেষে নিজেই খোরাকী দিয়ে দিতেন জায়গীরবাড়িকে। মাগরিবের আযানের আগেই নামাজঘরে সবাইকে জড়ো হতে হত।
.
আমাদের বাড়ির আয়তন ছিল বিরাট। কাছারিঘরের পাশেই দাদা একটা নামাজঘর বানিয়েছিলেন। সে ঘরে পাঞ্জেগানা নামায হত আর দু'বেলা পড়ালেখা। সকালে মক্তবও বসত সেখানে। সকালে হিন্দুছাত্ররা কাছারিঘরে বসত। মুসলমান ছাত্ররা নামাজঘরে আরবী পড়ত। কেউ কায়েদা। কেউ আমপারা। কেউ সরাসরি কুরআন শরীফ। হিন্দু ছাত্ররা পাশের কাছারিতে থাকলেও, মক্তবের উঁচু আওয়াজের পড়া শুনতে শুনতে অনেকের বেশ কিছু দোয়া-সূরা-কেরাত মুখস্থ হয়ে যেত। এ নিয়ে মজার ঘটনাও কম ঘটেনি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ধর্ম পরীক্ষার দিন, হিন্দু আর মুসলমান ছাত্রের পাশাপাশি সিট পড়েছে। শহরের জেলা স্কুলকেন্দ্রে। হিন্দু ছাত্রটি আমাদের স্কুলের, মুসলমান ছাত্র অন্য কোনও স্কুলের। মুসলমান ছাত্রটা যে কোনও কারণেই হোক, ধর্মপরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল করে নিতে পারেনি। আমাদের হিন্দু ছাত্রটি তাকে পাসমার্ক তুলে দিয়েছিল। সবাই অবাক,
-সুশান্ত, তুই এসব কোত্থেকে শিখলি?
-আমাদের হুজুর স্যারের কাছ থেকে শুনে শুনে!
ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। ওই মুসলমান ছাত্রের স্কুলের প্রধান শিক্ষক খোঁজ-খবর নিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এসেছেন। তার ভীষণ কৌতূহল, এ কেমন শিক্ষক, যার হিন্দু ছাত্ররাও ইসলাম ধর্মে পারদর্শী? পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার মত যোগ্যতার অধিকারী?
.
দাদার পড়ানোর পদ্ধতিও ছিল চমৎকার। তার সূত্র ছিল, অল্প মেহনতে বেশি লাভ। ভালোদেরকে দায়িত্ব দিতেন দুর্বলদেরকে পড়া বোঝানোর। তিনি ভালদেরকে আগে পড়াটা বুঝিয়ে দিতেন। সবার শেষে তিনি যাচাই করতেন, দুর্বলরা পড়া বুঝেছে কি না। স্কুলের পরীক্ষার পাশাপাশি দাদা ঘরেও পরীক্ষা নিতেন। দাদার ছাত্ররা আজ অনেকেই এপার বাঙলা ওপার বাঙলায় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত। এলাকার কেউ কেউ দাদার হিন্দুপ্রীতিতে বিরক্ত ছিল। সেই বিরক্তির মাশুল দিতে হয়েছিল একাত্তরে। নয়মাস জুড়ে। পাকবাহিনীকে

কারা যেন সংবাদ দিয়েছিল, তিনি ঘরে হিন্দু পোষেন। দাদার বিরুদ্ধে এটা ছিল মিথ্যা অপবাদ। দাদার মেহনত শুধু হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বড়দের সাথে দাদা পারতপক্ষে খুব একটা মিশতেন না। এছাড়া, দাদা কখনো হিন্দুদের পূজা-পার্বনে অংশ নিতেন না। তাদের আচার-বিচারকে সমর্থন করতেন না। হিন্দু ছাত্রের দেওয়া কোনও কিছু গ্রহণ করতেন না। এমনকি প্রতীমার মায়ের পাঠানো লাড্ডু-সন্দেশও কখনো ছুঁয়ে দেখতেন না। প্রতীমার মা, মানে আমাদের বেলামাসি, দাদার প্রথম দিককার ছাত্রী। তিনি কতকিছু বানিয়ে দাদার জন্যে আনতেন, দাদা সেসব ছুঁয়েও দেখতেন না। আমাদের বাড়ির কয়েক ঘর পরেই বেলামাসিদের ঘর। একছেলে একমেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে বাবার বাড়িতে থাকেন। বাবার বাড়িতে থাকলেও, তিনিই সবকিছুর মালিক। বাবা মেয়ের নামেই সবকিছু লেখাপড়া করে দিয়েছেন।

.

দাদার এই ঘরোয়া শিক্ষাশালায় আব্বু পড়েছেন, আমি পড়েছি। আব্বু বড় হয়ে মাদরাসায় গিয়েছেন। আমিও আব্বুর মতো একটু বড় হয়ে মাদরাসায়। আব্বু শুরুতেই আমাকে ঢাকা নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। যাতে হিন্দুদের সাথে পড়তে না হয়। কিন্তু দাদার অনঢ় অবস্থানের কারণে আব্বু সুবিধা করতে পারেননি। আমাকে নিয়ে দাদা আর আব্বুর শেষ কথোপকথনটা আজো, এতদিন পরেও কানে বাজে,

-বৌমার কাছে শুনলাম, তুমি আনাসকে (বলাইবাহুল্য ছদ্মনাম) ঢাকা নিয়ে যেতে চাও?

-জি¦, আব্বাজান, আপনার অনুমতি হলে!

-না, আমার অনুমতি হবে না। তুমি এত ছোট একটা বাচ্চাকে কোথায় রাখবে?

-মাদরাসাতেই থাকবে। মাঝেমধ্যে আসলাম ভাইয়ের বাসায় থাকবে।

-আসলাম মানে তোমার সেই বিহারী বন্ধুটা?

-আনাস তাদের ভাষা বুঝবে? আসলামের বউ আনাসের কথাই যদি না বোঝে, আদর-আবদার মেটাবে কী করে? যাক, ওসব কোনও ব্যাপার নয়, আনাস আরও কিছুদিন ওর দাদী আর মায়ের কাছে থাকুক। তারপর ঢাকা যাবে। এটাই চূড়ান্ত।

.

দাদাজি জোর করে কিছুদিন কাছে রাখার ফল তখন বুঝতে না পারলেও, অনেকদিন পর, বুঝতে পেরেছিলাম। দাদা বলতেন,

-ভাই, যতটুকু পারিস, ইংরেজি-অংক-বিজ্ঞান শিখে রাখ। একসময় কাজে লাগবে। দেখিস।

দাদা বুযুর্গ মানুষ ছিলেন। দাদার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বিষয় আগাম আঁচ করতে পারতেন। অনুমান করতে পারতেন। জালালাবাদের হামলায়, বিভিন্ন দেশী ভাইদের মাঝে সমন্বয় সাধনের কাজে, দাদার কাছ থেকে আহরিত ইংরেজীজ্ঞান অনেক কাজে লেগেছিল। আরপিজি ছোঁড়ার সময় নিখুঁত হিশেব কষতে হত। দূরত্ব, আবহাওয়া, বাতাসের গতি, সূর্যের তাপের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ত। একটা আরপিজি সংগ্রহ করতে আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। প্রতিটি আরপিজি দিয়ে যে করেই হোক, একটা ট্যাংক ধ্বংস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আরপিজি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে, এতকিছু লাগত না। দেখেই বলে দেয়া যেত, কাজটা কিভাবে করতে হবে। অবশ্য শফীক ভাই, প্রশিক্ষণ দেয়ার সময়, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম টার্মগুলো অনেক সহজ করে বোঝাতে পারতেন। দাদার জন্যে দিল থেকে দু'আ আসত। আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম,
ইয়া আল্লাহ, শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।
আব্বু তো শহীদ হয়েছেন, আমার দাদাকেও এই সৌভাগ্য দান করুন। আর কোনওভাবে যদি সম্ভব হয়, শাহাদাতের আগে, একবারের জন্যে হলেও দাদাজীর সাথে দেখা করিয়ে দিন।
দু'আটা করেছিলাম, কান্দাহার থেকে লালফৌজকে চূড়ান্তভাবে তাড়ানোর অভিযানের আগমুহূর্তে। আমরা যারা সে অভিযানে ছিলাম, কেন যেন সবার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, আমরা আজ যে যে দু'আ করেছি, আল্লাহ তা'আলা তার সবই কবুল করে নিয়েছেন। ময়দানে থাকলে, মেহনত শুরুর আগমুহূর্তের দু'আগুলোতে আমাদের অনেকেরই এমন অনুভূতি হত। আমার দু'আ শুনে মরোক্কী ভাই মুহাম্মাদ বললেন, আনাস! তুমি শাহাদাতের দু'আর সাথে দাদার দেখা করাকে মিশিয়ে ফেলেছ, এখন কী হবে জানো?
-কী হবে?
-তোমার শাহাদাত নসীব হবে না। অন্তত দাদার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত হবে না।
কী আশ্চর্য, শাহাদাত আমার নসীবে জোটেনি। কত ভয়ংকর অভিযানে অংশ নিয়েছি, আমার পাশে থাকা ভাই শহীদ হয়ে গেছেন, আমার ভাগ্যে জুটল না। ভাই মুহাম্মাদ সে অভিযানেই শহীদ হয়েছেন। আমি এখন শাহাদাতভূমি থেকে শত শত মাইল দূরে গ্রামবাঙলার মেঠো পথে হাঁটছি! রাতের আঁধারে, চাঁদের আবছা আলোয়! তবে কি দাদার সাথে দেখা হবে? আহ, এমন চাঁদনী রাতেই তো আমরা শাহাদাতের অভিসারে বের হতাম! প্রিয়তম রবের সান্নিধ্য লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে! আচ্ছা, আর কতদূর আছে?

ওইতো চারঘোনা মোড়, তারপরই জোতুলা দিঘী, এখনো অনেক পথ বাকি। হাঁটতে থাকি।

.

আশেপাশের মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা ছিল। বাড়ির বড়ঘরে বসত মেয়েরা। দাদী ছিলেন তাদের শিক্ষক। দাদী স্কুলের ছায়াও মাড়াননি, কিন্তু অবলীলায় উঁচু ক্লাশের অংক-ইংরেজী ধরিয়ে দিতে পারতেন। ঠেকে গেলে, দাদা তো ছিলেনই। দাদীর ঘরোয়া আয়োজনে পড়ার জন্যে, আনেক ছাত্রীর বাবা-মা, আশেপাশের আত্মীয়বাড়িতে মেয়েকে রাখার ব্যবস্থা করতেন। বিশেষ করে পরীক্ষার সময়। অবশ্য ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক কমই থাকত। আবার অনেক অভিভাবক মেয়েকে পড়তে পাঠাতেন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। মেয়ের যেন একটা ভাল বিয়ে হয়। দাদুর ঘরোয়া পাঠশালায় পড়া মেয়েদের ভালো ভালো বিয়ের সম্বন্ধ আসত। দাদীই আগে বেড়ে পাত্রের খোঁজ বের করতেন।
প্রতিবছর গ্রামে বার্ষিক মাহফিল হত। বিশাল কারবার। দশ-বিশ গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়ত। দাদা দুষ্টুমি করে দাদীকে বলতেন,
-আমি ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করলাম নাকি আপনার জন্যে পাত্র-পাত্রী যোগাড়ের সম্মেলন করলাম, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।
দাদীও কম যান না, তিনি মুচকি হেসে বলেন,
-ধান ঘাঁটতে ঘাঁটতে যদি আমও চোষা হয়ে যায়, মন্দ কি!
দাদা এমনি এমনি দুষ্টুমি করতেন না। আমাদের গ্রামের ওয়াজ মাহফিল হয়ে উঠত বরকনে খোঁজার মাহফিল। আগে জৌনপুরী তরীকার হুজুররা আসতেন। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে। আব্বুর জোরদার মেহনতে জৌনপুরী প্রভাব নেই। এখন হক্কানী ওলামায়ে কেরাম আসেন। পুরো বছর সবাই মাহফিলের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কতজনের কত রকমের স্বার্থ যে জড়িয়ে থাকত আমাদের মাহফিলের সাথে। এখনো কি মাহফিলটা হয়? হলেও আগের মতো জৌলুশ আছে?

.

বড় বড় ঘরের মহিলারা আসতেন মাহফিলে। পালকিতে চড়ে। নৌকায় চড়ে। গরুর গাড়িতে চড়ে। পুরুষরা ওয়াজের মাঠেই রাত কাটাতেন। মহিলারা যে বাড়িতে পারতেন, উঠে যেতেন। অদ্ভুত ব্যাপার, হিন্দুরাও তাদের ঘরদোর ছেড়ে দিত অভ্যাগতদের জন্যে। মাহফিলের তবারক (খাবার) হিন্দুরাও মহানন্দে সাগ্রহে চেটেপুটে খেতো।
দাদার কাজ বাইরে সামলানো, দাদীর কাজ ঘরের। পুরুষরা দাদার কাছে তাদের বায়না রাখত। কেউ পুত্রের জন্যে, কেউ নাতির জন্যে, কেউ ভাগ্নের জন্যে, কেউ ভাতিজার

জন্যে কনে প্রার্থনা করত। দাদা সেসব প্রার্থনা যথাস্থানে অন্দরমহলে পৌঁছে দিতেন। দাদীর কাছেও মহিলাদের জোর ভীড়! মাহফিলের সময় দাদীর কাছে ঘেঁষা দায়। দূর-দূরান্তের মহিলারা কেউ স্বামীর সাথে, কেউ ছেলের সাথে, কেউ নাতির সাথে এসেছেন। ওয়াজের দিনগুলোতে অন্দরে পুরুষদের গতিবিধি সীমিত ছিল। হুট করে ঢুকে পড়ার উপায় ছিল না। সদর ফটকে রীতিমতো দারোয়ান থাকত।

.

দাদী গভীর মনোযোগের সাথে বর-কনের মিল করতেন। সবার প্রথম পছন্দ ছিল, দাদীর হাতেগড়া ছাত্রীরা। নিতান্ত পল্লী বধূ হয়েও, দাদী এতবড় একটা দায়িত্ব কিভাবে এত সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন, আজো ভাবতে অবাক লাগে! দাদু কি বেঁচে আছেন? আজ গিয়ে মায়ের সমতুল্য দাদীকে না পেলে ঘরে মন টিকবে?
মাহফিল হত তিনদিন, দ্বিতীয় দিন রাতের মধ্যেই সবকিছু গোছগাছ করে ফেলতে হত। দুই পক্ষের আলাপ-আলাপন, মতবিনিময়, দেন-দরবার সব এর মধ্যেই সেরে ফেলতে হত। তৃতীয় দিন সকাল থেকে শুরু হত বিয়ে পড়ানো। সে এক দেখার মত ব্যাপার। গণবিবাহ যাকে বলে। মেয়েরা অন্দরে, ছেলেরা স্টেজের উপর সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে। ছোট ছেলেপিলেদের আনন্দমাখা ছোটাছুটির অন্ত নেই। তাদেরও চোখে নেশা, বিয়ে করলে এভাবেই করতে হবে। একদিন তাদেরও এভাবে বিয়ে হবে! কবে আসবে সেদিন?

.

এতো গেল বিয়ের ব্যাপার। এছাড়াও আমাদের মাহফিল ছিল গ্রামের মেয়েদের মিলনমেলা। ওয়াজ উপলক্ষ্যে মেয়েরা বাপের বাড়িতে নাইওর আসত। সারা বছর তারা ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুণত, কবে আসবে মাঘ মাস। কবে হবে সেই স্বপ্নের মাহফিল। কবে যাবে নিজের বাড়ি। কবে দেখা হবে সখিদের সাথে। এদের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সম্বন্ধ নিয়ে আসত। কেউ গর্বের সাথে শ্বশুর শাশুড়িকে সাথে নিয়ে আসত। কেউ ননদকে নিয়ে আসত। নিতান্ত অযোগ্য বরও যেমন এখানে কনে পেয়ে যেত, দাদু অনেক বিধবা বুড়িরও বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতেন। সবাই বলাবলি করত, মঈয়ের (দাদীকে সবাই মঈ মানে ‘খালা’ বলে ডাকতো) হাতে জাদু আছে। কারো বিয়ের প্রয়োজন হলে,শুধু মইয়ের কাছে ফেলতে পারলেই হল, এবার বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দাও। ঘুম থেকে ওঠে টোপর পরে সোজা মাস্টারবাড়িতে চলে এসো। তারপর বউ-জামাই নিয়ে বাড়ি ফেরো। আসলেও তাই।

.

এক সিরিয়ান ভাইয়ের শখ হল, আফগান মেয়ে বিয়ে করবে। আমরা তখন খোস্তে। প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে আপাতত কিছুদিন দূরের অভিযান বন্ধ আছে। আমার কাছে সিরিয়ান ভাই সুহাইব বলল,
-আখী আনাস, আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আফগান মেয়েকে। এত সাহসী একটা জাতি, তাদের একজনকে জীবনসঙ্গী হিশেবে পেলে, আমার মধ্যে সে সাহস কিছুটা হলেও সঞ্চারিত হবে।
-সেরেছে! এখানে এই বিরান পাহাড়ে তোমার জন্যে আফগান মেয়ে কোথায় পাই? আমি দাদীর গুণধর নাতি না! সুহাইবকে আশ্বাস দিলাম, তুমি একদম চিন্তা করবে না, তোমার বিয়ের ব্যবস্থা আমি করছি। অনেক কায়দা করে কনে ঠিকই জোগাড় করে ফেললাম। কনে একজন আরবের কাছে অতি আগ্রহের সাথে বিয়ে বসতে রাজি হয়েছে। সে জানে, এই বিয়ের পরিণতি কী হতে পারে, তবুও আফগানের আল্লাহর বান্দীরা পিছিয়ে যেতে রাজি ছিল না। তারা আমাদেরকে জান্নাত থেকে নেমে আসা সবুজ পাখি মনে করত। আমাদের সাথে জীবনকে জড়াতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত। খবর পেয়েছি সেই সিরিয়ান ভাই এখন হালাবের এক জেলে আছে। আফগানী বিবিকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল। কী এক জীবন গিয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল সন্তানগুলো সেখানে জড়ো হয়েছিল। তাদের সবাই ছিল জান্নাতপিয়াসী। সাহাবায়ে কেরামের যুগ যেন সত্যিকার অর্থেই বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল।
.
মাহফিলের আরেকটা দিকও উল্লেখযোগ্য, মাহফিলে এসে অনেকেই ইসলামগ্রহণ করত। মাহফিলের প্রভাব দূর-দূরান্তের হিন্দুগ্রামগুলোতেও পড়ত। তবে অনেকের কাছে ইসলাম ভাল লাগলেও, লোকলজ্জা বা সমাজের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারত না। তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হত, দূরের কোনও মাহফিলে বা হুজুরের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে। তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গোপনে দাদাই বহন করতেন। এ-বিষয়ে দাদার আলাদা একটা খাতাই ছিল। কাকে কত দিয়েছেন, আরও কত দিতে হবে, তার খতিয়ান থাকত। দাদা আমাকে দিয়ে হিশেবটা করাতেন। কেন করাতেন সেটা এখন বুঝি! খাতাটা কি এখনো আছে?
.
আমি ছিলাম দাদা ও দাদী উভয়ের হাতের যষ্ঠি। আম্মুও দাদীকে সাহায্য করতেন। তবে আম্মু রান্নাবান্নার কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। পড়তে আসা মেয়েরাও সাহায্য করত। দাদী আমাকে দায়িত্ব দিতেন ছোট মেয়েদেরকে পড়ানোর। দাদাও মক্তবে পড়ানোর দায়িত্ব

দিতেন। দু'দিকের টানাটানিতে বেশ ব্যস্ত সময় কাটতো। কখনো কাছারির মক্তবে কখনো অন্দরের বড়ঘরে পড়িয়ে মাত্র দশ বছর বয়েসেই বেশ দক্ষ হয়ে উঠছিলাম। পড়াতে পড়াতে এক বছরেই কয়েক বছরের পড়া হয়ে যাচ্ছিল। স্কুলে না গিয়েও স্কুলের যোগ্যতা হয়ে যাচ্ছিল। দাদা আমাকে বাড়তি কাজ দিয়েছিলেন, কুরআন কারীম হিফয করা। আশেপাশে কোনও হুজুর ছিল না। মসজিদের ইমাম সাহেব আলেম নন, দুয়েক জামাত পড়েছেন মাত্র। তার কাছেই হিফয শোনাতাম। আব্বুই ছিলেন অত্র অঞ্চলের প্রথম আলেম।

.

একদিন অন্দরে মেয়েদেরকে পড়াচ্ছি, লম্বা ঘোমটা দেয়া মহিলা এলেন। পরে ঘোমটা সরানোর পর দেখলাম তিনি আর কেউ নন, আমাদের বেলামাসি। সাথে নিয়ে এসেছেন একটা ছেলে ও একটা মেয়েকে। বড়ভাই বাদল আর ছোট প্রতীমা। দাদীকে বললেন,

-আমি এবার থেকে বাবার ঘরেই থাকবো। বাচ্চাদের পড়াশোনার একটা হিল্লে করে দিলে ভালো হয়। আপনি মাস্টারমশাইকে একটু বলে দিন না!

-ঠিক আছে বলে দেব।

আমাদের স্কুলের সদস্যসংখ্যা দু'জন বাড়ল। বাদল গেল সদরে, প্রতিমা জায়গা পেল অন্দরে। দাদা পরদিন দু'জনকে হাত ধরাধরি করে স্কুলে নিয়ে গেলেন। নিজে উপস্থিত থেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তারা আগেও স্কুলে পড়ত বাবার বাড়িতে। বাবা মারা যাওয়ার পর, অর্ধেক বছরে এখানে এসে ভর্তি হয়েছে। স্কুলে ভর্তি হয়েছে নামকাওয়াস্তে। আসলে মূল পড়াটা হত আমাদের ঘরোয়া পাঠশালায়।

.

বেলামাসি বিধবা হয়ে এলেও, একেবারে সর্বস্বহারা ছিলেন না। স্বামীর তরফেও বেশ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তার বাবাও অবস্থাপন্ন। মাসির বিয়ের বন্দোবস্ত দাদা করে দিয়েছিলেন। দাদার এক ক্লাসমেটের ভাতিজার সাথে। শোনা কথা, বেলামাসি নাকি বিয়ে করতে চাননি। তিনি আইবুড়ি হয়ে গ্রামেই থাকতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে, তার এই ইচ্ছার পেছনের কারণ ছিল, দাদার কাছাকাছি থাকা। সত্যমিথ্যা আল্লাহই জানেন। বাড়ির কেউ কখনো এ-নিয়ে মুখ খোলেননি। অন্য কারও কাছ থেকেও জানার সুযোগ ছিল না। দাদা ছিলের বেলামাসির বাবার বয়েসি। তবে বেলামাসির হাবভাবে বুঝতাম, তিনি দাদাকে দেবতার চেয়েও বেশি কিছু মনে করতেন। এটা ছিল শিক্ষকের প্রতি ছাত্রীর শ্রদ্ধা। আর দাদার মতো পরোপকারী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বেলামাসির পড়াশোনার পেছনে দাদার অনেক অবদান ছিল। মেট্রিক পরীক্ষায় ভাল

ফলাফল করার পেছনেও দাদার পরিশ্রম ছিল। তখন দাদা মোটে চাকুরিতে জয়েন করেছেন। এখনকার মতো রীতিমতো হুজুর হয়ে উঠেননি। কিন্তু বিয়ে করেছেন, আব্বুর জন্মও হয়ে গেছে। দাদা মেয়েদেরকে স্কুলে উপস্থিত নিরুৎসাহিত করতেন। বাড়িতে পড়েই যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, সে ব্যবস্থা করে দিতেন। আর ছাত্রীর সংখ্যা খুব একটা ছিলও না। মুসলিম ছাত্রীরা দাদীর কাছে পড়ত। কিছু হিন্দু মেয়ে স্কুলে ভর্তি হত। দুয়েক ক্লাশ পর তাদেরও বিয়ে হয়ে যেত।
দাদাকে কখনো মাসির সাথে কথা বলতে দেখিনি। সরাসরি বা পর্দার আড়াল থেকে, কোনওভাবেই না। দাদা বেগানা কোনও নারীর সাথে পারতপক্ষে কথা বলতেন না। বিশেষ কোনও জরুরত থাকলে, দাদীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। দাদিই সবকিছু শুনে দাদার কাছে এসে বলতেন। দাদা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে দাদার কাছে আসত, দাদা সাধ্যমত সমাধানের চেষ্টা করতেন। হিন্দুরাও তাদের বিচার অভিযোগ নিয়ে দাদার কাছে আসত। তাদের দাম্পত্য কলহের মিটমাটও দাদাকে করতে দেখেছি। দাদা ছিলেন ফেরেশতাতুল্য মানুষ। আভাসে ইঙ্গিতে বেলামাসীর প্রতি দাদার কোনও আবেগ বা দুর্বলতা টের পাইনি। দু'জনের বয়েসেরও অনেক তফাত। বাবা মেয়ের মতো। ধর্মেরও পার্থক্য। দাদা হলেন সাগরের মতো। পরিচিত অপরিচিত সকলেই এই সাগরে স্থান পেয়ে যায়। যা কিছু রটে, কিছু না কিছু ঘটে। দাদার দিক থেকে না হলেও, মাসির দিক থেকে কিছু থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। দাদার মতো এমন তুখোড় শিক্ষক, সর্বজন প্রিয়, রসিক, মিশুক, জনদরদী মানুষের ব্যক্তিত্বের সুতীব্র দুর্নিবার টানে যে কেউ আকর্ষিত হতে পারে। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যেভাবে দাদার জন্যে জানপরান, একজন কিশোরীর মনে 'বীরের' প্রতি অন্ধভক্তি জাগা অস্বাভাবিক নয়।

.

হেরাতে থাকাকালে দেখেছি, বিদেশী মেহমানদের প্রতি স্থানীয় অমুসলিমদেরও সে কি শ্রদ্ধা। আফগানে ভিন্নধর্মাবলম্বী খুব একটা নেই। প্রায় ৯৯ ভাগই মুসলমান। কিছু ইহুদি ছিল, তারা ইসরায়েলে চলে গেছে। অল্পসংখ্যক হিন্দু আছে, পার্সি আছে, শিখ আছে। তারাও আমাদের প্রতি মুগ্ধ আচরণ করত। রাশানদের নির্বিচার বোমা বর্ষণ থেকে অমুসলিমরাও রেহাই পেত না। কিন্তু মুজাহিদদের কাছে তারা নিরাপত্তা পেত। নির্ভরতা খুঁজে পেত।

.

বেলামাসি আমাদের ঘরে এলেই দাদি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু আচরণ বা কথাবার্তায় সেটা কোনওভাবেই ফুটে উঠতে দিতেন না। দাদির এই চাপা অস্বস্তি দেখে আম্মু আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসতেন। আম্মু কেন হাসছেন, জিজ্ঞেস করলে বলতেন
-তুই বুঝবি না, তোর সেটা জেনে কাজ নেই।
বেলামাসিকে দেখলে মনেই হত না, স্বামীর মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছেন। তিনি দিব্যি দুই সন্তান নিয়ে সুখে আছেন। যখন-তখন ঘরে এসে আম্মুর সাথে গল্প জুড়ছেন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর করছেন। আমার মনে হয় সেটা ছিল আমাদের বাড়িতে আসার ছুতো। আল্লাহর কী অদ্ভুত মহিমা, তিনি আমাদেরকে এত ভালোবাসেন, কিন্তু কখনো ইসলামের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। আবার তার মেয়ে সারাদিন আমাদের বাড়িতে থেকে থেকে আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে, সেটা নিয়েও তাকে তেমন একটা ভাবিত হতে দেখিনি।
.
প্রতিমা একদম ছোট থেকেই আমাদের বাড়িতে আসা শুরু করেছে। বলা যায়, দুধের বয়েস থেকে। দাদার বাড়ি থেকে প্রতিমারা যখন পাকাপাকি চলে এসেছেল, তখনো প্রতিমা দুধের শিশু। আমিও ছোট। তার বেড়ে ওঠা, বড় হওয়ার বেশিরভাগই ইসলামী আবহে হয়েছে। দাদু ও আম্মুর মনে বোধ হয় একটা কন্যা সন্তানের অভাববোধ ছিল। সে অভাব প্রতিমাকে দিয়ে কিছুটা পূরণ হত। মেয়েটাও দাদু আর আম্মুর ন্যাওটা ছিল। সে নিজের বাড়ির দুর্গার মূর্তির চেয়ে আমাদের বাড়ির রুকু-সিজদার দৃশ্যই বেশি দেখেছিল। তারপরও সে একজন হিন্দু। পূজা-পার্বণে তাকে মায়ের সাথে অংশ নিতে হত। মন্দিরে যেতে হত। গান-বাদ্যি শুনতে হত। আরতিতে অংশ নিতে হত।
.
যতদিন ছোট ছিলাম, দাদুর সাথে অন্দরে পড়ানোর কাজে অংশ নিয়েছি। বড় হওয়ার পর দাদা আমার ভেতরে যাওয়া সীমিত করে দিয়েছিলেন। পড়তে আসা মেয়েরা থাকলে, দাদীও আমাকে ভেতরে যেতে দিতেন না। পর্দার ব্যাপারে দু'জনেই বেশ কঠিন ছিলেন। দাদার সাথে দাদুও জৌনপুরী তরীকায় মুরীদ ছিলেন। দাদুও পীরের দেয়া সবক নিয়মিত আদায় করতেন। মোটাদাগে সবকগুলো ছিল,
১; নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করিবেন।
২. হালাল রুজি ভক্ষণ করিবেন।
৩. পর্দা-পুশিদা মানিয়া চলিবেন।
৪. বে-শরা, বেদাতি কাজ থেকে বাঁচিয়া থাকিবেন। হিন্দুয়ানী প্রথা হইতে দূরে থাকিবেন।

আব্বু বলতেন, আপনাদের সবকে আছে, বেদাতি কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন, কিন্তু বেদাতি কাজ ঠিকই করেন।
দাদা বলতেন,
-আমাদের দাদাপীর কারামত আলি রহ.-এর মধ্যে বেদাত ছিল কি না জানি না, না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি শিক্ষা পেয়েছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর পুত্র আবদুল আযীয রহ.-এর শিষ্যদের থেকে। যতদূর জানি, দাদাপীরের পরে আসা খোলাফাদের হাত ধরে এই তরীকায় বেদাত ঢুকে পড়েছিল। আর আমি এখন জৌনপুরের ধারায় চলি না। তারপরও প্রত্যেকেই, যে মাধ্যমে দ্বীন পায়, সে মাধ্যমের প্রতি আজীবন দুর্বলতা থেকে যায়। তুমি কওমী মাদরাসায় পড়লেও, দ্বীন কিন্তু জৌনপুরের বরকতেই দ্বীন পেয়েছ। তুমি যতই দেওবন্দ বলে চেঁচাও না কেন, তুমি জৌনপুরের অবদান অস্বীকার করতে পারবেন না। গ্রামবাঙলায় দ্বীন প্রচারে, কারামত আলি রহ.-এর মতো অবদান আর কারো আছে কি না, আমার জানা নেই। তিনি স্বীয় মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর হুকুমে বাঙলা-আসামে মেহনত করতে আসেন, তখন বাঙলা-আসামে মুসলিম নামধারী মানুষ ছিল, প্রকৃত মুসলিম কেউ ছিল কি না, সন্দেহ আছে। তিনি যখন মেহনত শুরু করেন, তখন তোমার দেওবন্দের জন্মও হয়নি।
-আব্বাজি, আমরা মোটেও হযরত জৌনপুরীর বিরাট খেদমতকে অস্বীকার করি না। ছোট করেও দেখি না। আমরা শুধু বেদাতের বিরুদ্ধে বলি।
-তুমি বোঝানোর পর থেকে আমি বেদাতি মীলাদ-কেয়াম ছেড়ে দিয়েছি। আরও যেসব আমলকে শরীয়তবিরোধী বলেছ, ছেড়ে দিয়েছি। আমি দ্বীনকে ভালোবাসি। দ্বীন মানতে চাই। ভুলভাল মনগড়া আমল করে গুনাহগার কেন হব?
-আমরা কেউ হযরত জৌনপুরী রহ.-এর উপর বেদাতের অভিযোগ আনি না, তার প্রতি আমাদের একটা কষ্ট হল, তিনি ইংরেজ সরকারের তাবেদারী করেছেন! তাদের স্বপক্ষে কথা বলেছেন!
-দেখ বাবা, এটা তোমাদের আলেমদের এলাকা, এ-বিষয়ে কথা বলার মত যোগ্যতা আমার নেই। আমি এখন আর জৌনপুরী তরীকার মুরীদ নই, তাদের বেদাতের সাথেও নেই। আমি শুধু বুঝি,
হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়া হয়েছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর পরিবার থেকে। জৌনপুরী রহ. এই পরিবারেরই ছাত্র। তা সত্ত্বেও তিনি কেন, ফতোয়ার বিপরীতে হিন্দুস্তানকে ‘দারুল আমান’ বললেন, সেটা বোঝার মতো ইলম আমার নেই। দারুল হারব বিষয়ে জৌনপুরী হযরতের সাথে ফরায়েজীদের মুনাজারা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু

ফরায়েজীরা হেরে গিয়েছিল। তারপরও আমি মনে করি, হিন্দুস্তান দারূল হারব, এটাই সঠিক। পাশাপাশি মনে করি, জৌনপুরী হযরতের অবস্থানেরও কিছু যুক্তি আছে। আগে জুমা-ঈদের নামায হতো না। মসজিদসমূহে দিনের বেলা আযান হতো না, জৌনপুরী হযরত এসব চালু করেছেন। এটা অনেক বড় কাজ।

আর যদি দারুল হারবের প্রসঙ্গ তোল, সে হিশেবে এখন পাকিস্তান আমলে এসেও আমরা দারূল হারবে আছি। পাকিস্তানের সামরিক সরকার তালাক বিষয়ে শরীয়ত বিরোধী আইন করেছে। তাহলে এদেশ কি দারুল ইসলাম আছে? যারা ময়দানে কাজ করে, তাদের ভুলভাল হয়েই যায়। নিখুঁত মানুষ পাওয়া মুশকিল। তোমাদের থানবী রহ.-ও কিন্তু কানপুরে থাকাকালে কিছুদিন তার মুর্শিদের অনুকরণে মীলাদ পড়তেন। পরে গাঙ্গুহী রহ.-এর পরামর্শে তা বর্জন করেছেন। পুরো দেওবন্দের যিনি গুরু, তার মধ্যেই তো এক সময় বেদাত ছিল!

-তিনি পরে শিষ্যদের কথায় ভুল বুঝতে পেরে মীলাদ ছেড়ে দিয়েছেন!

-জি¦, ছেড়েছেন। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এত বড় বড় মানুষের পীর হওয়ার পরও যদি হাজী এমদাদুল্লাহ রহ.-এর আগের জীবনে বেদাত থাকাটা মেনে নেয়া যায়, জৌনপুরী হযরতেরটা মেনে নিলে সমস্যা কোথায়! আর ইংরেজ আমল ও এখনকার মধ্যে পার্থক্য কি? খুব একটা পার্থক্য নেই। কই এখন তো সব আলিমই দিব্যি দারুল ইসলামে থাকার মতোই চুপচাপ? আমরা জৌনপুরী হযরতের ভুল ফতোয়া গ্রহণ করব না। সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ালিউল্লাহ পরিবারের অনুসরণ করব।

-আব্বাজি, হাজী সাহেবেরটা ছিল বেদাত এবং ব্যক্তিগত মাসয়ালার বিষয়, কিন্তু জৌনপুরী হযরতেরটা ছিল ঈমান ও কুফরের মাসয়ালা এবং পুরো জাতির ঈমান-আমল জড়িত!

.

বাপ-বেটার এই ঘরোয়া বিতর্কে আমি সাথেই থাকতাম। দাদা বা আব্বু কেউই আমাকে উঠে যেতে বলতেন না। তারা যেন চাইতেন, আমি পাশে থাকি। এসব দেখি ও শুনি ও শিখি। দাদা আসলে জৌনপুরী তরীকা ছাড়লেও, হৃদয়ের গহীনে কোথাও এই তরীকার পূর্বপুরুষদের প্রতি মহব্বত পোষণ করতেন। কারামত আলি রহ. তার মুর্শিদের সাথে বালাকোটের জিহাদে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। এজন্য একজন মল্লযোদ্ধার কাছে প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। কিন্তু মুর্শিদ তাকে জিহাদে অংশ না নিয়ে বাঙলা-আসামের মেহনতে নিয়োজিত থাকতে হুকুম দিয়েছিলেন। মুর্শিদের আদেশ পালন করতে গিয়েই তিনি বালাকোটের জিহাদে ও ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে অংশ নিতে পারেননি।

দাদাপীর সাইয়েদ শহীদ রহ.-এর প্রভাবেই কি না জানি না, দাদার মধ্যে জিহাদী জোশ প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি সাইয়েদ আহমাদ রহ.-এর আদর্শকে নিজের মধ্যে ধারন করতেন। আবার হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. যে শামেলীর ময়দানে ইংরেজবিরোধী লড়াইয়ে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেটাকেও পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেন।

.

আমি পেশোয়ার যাওয়ার আগে দাদাকে চিঠিতে বিস্তারিত জানিয়েছিলাম। দাদা আহমাদ শাহ আবদালী রহ.-এর জিহাদের ইতিহাস আমাকে শোনাতেন। এখন আমি তার নাতি হয়ে আবদালির দেশে যাচ্ছি শুনে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন। চিঠির জবারের অপেক্ষা করার সময় ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি এসে যাচ্ছে। এখানে সমতল ভূমিতে সামান্য হেঁটেই হাঁপ ধরে যাচ্ছে, অথচ পাঞ্জশীর উপত্যকা সংলগ্ন অঞ্চলের অভিযানগুলোতে রাতের বেলায় একেকদিন তিনঘণ্টাও একটানা হেঁটেছি। তাও চড়াই-উৎরাই দিয়ে। কোনও ক্লান্তি অনুভব হয়নি। পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে কত বদলে দেয়!

.

প্রতিমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি তার মায়ের হাতে হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয়েছিল দাদীর ঘরোয়া পাঠশালায়। বাবা নেই, তাই সবাই তাকে আদর করত। মেয়েটা ছিলও চুপচাপ প্রকৃতির। পড়া দিলে খুব দ্রুত মুখস্থ করে ফেলত। এমন ছাত্রী পেয়ে আমি আটখানা। তারপর ঢাকায় চলে এলাম। প্রতিমাসে না হলেও প্রায়ই বাড়ি যাওয়া হত। যে কয়দিন থাকতাম দাদী আমাকে শিক্ষকের আসনে বসিয়ে দিতেন। ছাত্রীরা ছিল আমার চেয়ে বড়। ছোটও ছিল। মুসলিম ছাত্রীদেরকে আরবী পড়াতাম। বাঙলা পড়ার সময় ছোটদেরকে পড়ানোর ভার আমার কাঁধে চাপত। কখনো দাদার সাথে নামাজ ঘরে পড়ানোর কাজেও অংশ নিতে হত। সেখানে বেশিরভাগ সময় আরবী পড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হত।

.

বেলামাসি মেয়েকে পড়াতে গিয়ে, একটা লাভ হয়েছে এই, তার কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। তার ছিল বইয়ের নেশা। পল্লী গাঁয়ে থেকেও তিনি কিভাবে যেন বই জোগাড় করে ফেলতেন। তার আব্বুরও ছিল বই পড়ার ঝোঁক। বাড়িতে আলমিরা ভর্তি থরে থরে বই সাজানো ছিল। নতুন বইও ডাকযোগে সংগ্রহ করতেন মাসি। অামাকে পড়ে শোনাতেন। কবিতা, গল্প, রূপকথা। বুঝতে পারতাম, তার মেধা অনেক ভাল ছিল। তিনি বিরাট বিরাট কবিতা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। আবৃত্তির ঢঙে।

কখনো সুর করে। বাঙলা বই না পড়েও আমি সে বয়েসেই বাঙলা সাহিত্যের সেরা গল্পগুলোর নির্যাস পেয়ে গিয়েছিলাম। বাঙলার সেরা কবিদের কবিতা শোনা হয়ে গিয়েছিল।

.

যেখানেই যাই, কিভাবে যেন অবধারিতভাবে শিক্ষকতার ভার আমার কাঁধে এসে চাপে। ঢাকাতে আমাদের মাদরাসার পাশেই ছিল আব্বুর ঘনিষ্ঠ ‘দোস্তইয়ার’ আসলাম চাচ্চুর বাসা। হেফয গ্রামেই শেষ করে এসেছি। এখানে কিছুদিন শোনাতে হবে। প্রথম দিকে মাদরাসার রান্না খেতে পারতাম না। চাচীর উপুর্যপরি আবেদনের প্রেক্ষিতে, আব্বু আমাকে বাসায় খেতে দিতে রাজি হলেন, কিছু দিনের জন্যে। তবে এমনি এমনি নয়, বিনিময়ে আমাকে কিছু করতে হবে! কী করা যায়? পড়াতে হবে। চাচুর অতি আদরের মেয়ে ‘রুবাবাকে’। আমি পড়ে গেলাম সংকটে। রুবাবা কী সুন্দর উর্দুতে কথা বলে, বাঙলা বোঝে না। আমি তাকে কিভাবে পড়াব? আব্বুর উত্তর,

-তোমাকে বাঙলা বলতে হবে না, আরবী পড়াবে, উর্দু বলার দরকারই পড়বে না।

শুরু হলো পেশাজীবির জীবন। পবিখা। পড়ার বিনিময়ে খাদ্য। রুবাবাকে দেখলাম প্রতিমার একদম উল্টো। ওর মুখ দিয়ে রীতিমতো খই ফোটে। চাচী পইপই রুবাবাকে বলে দিয়েছেন,

-যতক্ষণ পড়বে ওস্তাদজির সাথে কথা বলবে না। শুধু পড়বে।

কে শোনে কার কথা! দুষ্ট মেয়ে এসে কিতাব রেখেই বলবে,

-ভাইয়া, ওহ মা‘ফ কীজিয়ে, ওস্তাদজি! পেহলে এক বাত বাতাইয়ে....!

এই একবাত কখনো দশবাতে কখনো শতবাতে গিয়ে ঠেকতো, কিন্তু পাকনা মেয়ের ‘বাতই’ ফুরোত না! আসলে সারাদিন ঘরে বন্দী হয়ে থাকত, কথা বলার মানুষ পেত না, তাই আমাকে পেয়েই তার মুখের মনের অর্গল খুলে যেত। কত গল্প যে মেয়ে জানত! বিহারের পেহেলগাঁওয়ে তাদের কতগুলো ভঁয়স (মহিষ) ছিল, তাদের পোষা ঘোড়াটা কিভাবে চিঁ হিঁ হিঁ করতে, তাদের গেন্না (আখ) ক্ষেতটা কতবড় ছিল, সব বলেও তার কথা শেষ হত না। চাচী এসে ধমক দিয়ে দস্যি মেয়েকে থামাতেন। মেয়ে গাল ফুলিয়ে পড়া শুরু করত, ওয়াশ শামসি ইযা.....! মা চলে যেতেই পর্দার দিকে ফিরে ভেংচি কেটে আবার শুরু করত, ভাইয়া ওহ ওস্তাদজি, স্রেফ একবাত............!

.

লুবাবা চাচী ছিলেন হায়দারাবাদের মেয়ে। ছেলেবেলা কেটেছে দিল্লীতে। বিয়ে বিহারে। পুরো ভারতের প্রতিনিধি যেন তিনি। তার মুখের উর্দু এত সুন্দর আর এত মিষ্টি, লাহোরে-

পেশোয়ারে-আফগানে কত উর্দুভাষীর সাথেই থাকলাম, কাউকেই চাচীর মতো চোস্ত উচ্চারণে উর্দু বলতে দেখলাম না। চাচী উর্দু বলতেন হায়দ্রাবাদের বনেদী নবাবী যবানে। তার দাদা কর্মসূত্রে দিল্লীতে থাকতেন। প্রেসে চাকুরি করতেন। পাকিস্তানের বিখ্যাত দু'টি পত্রিকা দৈনিক ঝঙ্গ আর ডেইলি ডন, দু'টোরই জন্ম দিল্লীতে। ঝঙ্গ ১৯৪০ সালে। মীর খলীলুর রহমানের হাত। আর ডন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খোদ কায়েদে আজম জিন্নাহ। ১৯৪১ সালে। জিন্নাহ ডন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিম লীগের মুখপাত্র হিশেবে। দুই পত্রিকাতেই চাচীর দাদু কাজ করতেন। তাই ছেলেবেলা থেকেই দৈনিক পত্রিকা পড়ার অভ্যেস গড়ে উঠেছিল। দুই পত্রিকাই দাদা প্রতিদিন বাসায় নিয়ে আসতেন। সাতচল্লিশে দেশভাগ হল। দুই পত্রিকাও দিল্লির পাট চুকিয়ে করাচির পথ ধরল। চাচীর দাদু ওপারে গেলেন না। সবকিছু গুটিয়ে হায়দ্রাবাদে ফিরে এলেন। সাথে কিছু আনলেন না। শুধু কয়েক বস্তা পত্রিকা সাথে নিয়ে এলেন। এগুলো তার সন্তানের মতো। তার যত্ন আর আদরে এর প্রতিটি সংখ্যা ছাপা হয়েছে।
বৃদ্ধ বয়েসে ঘরের ইজিচেয়ারে বসে, নাতনীকে পুরনো পত্রিকা পড়ে শোনাতেন। পুরো পত্রিকার মেকআপ দাদুর হাত দিয়ে হত, কিছুতেই ছোট্ট লুবাবার বিশ্বাস হতে চাইত না।

.

ডনের দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন আলতাফ হুসাইন। তিনি ১৯৪৭ থেকে১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডনে আমৃত্যু কাজ করেছেন। আলতাফ হুসাইনের সাথে চাচাজির কী এক সূত্রে পরিচয় ছিল। আর পত্রিকায় কাজ করার সুবাদে চাচীর দাদা আর সম্পাদক আলতাফ হুসাইন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দু'জনের পদ উঁচুনিচু থাকলেও, বন্ধুত্বে কোনও উঁচুনিচু ছিল না। দেশভাগের পরও দু'জনের মধ্যে পত্রযোগাযোগ ছিল।

.

একদিন চাচী আমাকে বললেন,
-বেটা আনাস, তুমি কি জানো, এই ডন পত্রিকার সম্পাদকের বাড়ি তোমাদের মাশরেকি পাকিস্তানে?
-তাই, কোথায়?
-সিলহত!
-ও সিলেটে? আশ্চর্য তো?

.

চাচী স্বামীর সাথে ঢাকায় এসেও পত্রিকা পড়ার নেশা ছাড়তে পারেননি। চাচী আগে দাদার সাথে পড়তেন পুরনো পত্রিকা। এখন পড়েন তাজা। চাচাজি বাসায় দুই পত্রিকাই

রাখতেন। এতেও যদি চাচীর মনটা ভাল থাকে। অবশ্য করাচি থেকে বিমানযোগে ঢাকায় পত্রিকা আসতে আসতে তারিখ পার হয়ে যেত। তা যাক, চাচীর কথা হল, ভাল জিনিস বাসী খেতেও মন্দ লাগে না। মায়ের সাথে থেকে থেকে পিচ্চি রুবাবাও দৈনিক ঝঙ্গের জঙ্গী হয়ে উঠল। এতটুকুন বয়েসেও কী সুন্দর টুকুস টুকুস পত্রিকা পড়ে ফেলতে পারত। রুবাবাকে উর্দু পড়তে দেখে আমার আঁতে ঘা লাগত। আমিও দাদার কাছে টুটাফাটা ইংরেজি শিখেছি। সেটাকে প্রকাশ করার সুযোগ হাতছাড়া করবো কেন। সে ঝঙ্গ নিয়ে বসলে, আমি ডন নিয়ে বসতাম। চাচী একদিন দেখে বলল,
-মাশাল্লাহ, তুঝে আংরেজি আতী হ্যায়?
-জি¦, আমি দাদার কাছে শিখেছি।
-আচ্ছা, বহুত খুউব!
এরপর চাচী রুটিন ঠিক করে দিলেন, প্রথমে আরবী পড়া হবে। তারপর গুরু হবে শিষ্য আর শিষ্যা হয়ে যাবে গুরুজি। রুবাবা আমাকে ঝঙ্গ পড়ে শোনাত, আমি তাকে ডন পড়ে শোনাতাম। আসলে দু'জনের কেউই ভাল করে বুঝতাম না। রুবাবা ঝঙের সব উর্দু পড়তে পারত না, বুঝতোও না। অপরদিকে আমিও ডনের সবকিছু বুঝতাম না। এটা হল প্রথম দিকের অবস্থা। আস্তে আস্তে দেখা গেল, চাচী আমাদের দু'জনেরই শিক্ষক বনে বসে আছেন। দু'জনে আটকে গেলে চাচী এসে সমাধান করে দিতেন।
.
ভাবতে অবাক লাগে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি পদে পদে আমার জন্যে শিক্ষার এমন কল্পনাতীত ব্যবস্থা করে দিতেন, এখন ভাবলে হয়রান হয়ে যাই। চাচীর কাছে কি কি শিখেছি তার ফিরিস্তি আস্তে আস্তে আসবে। একটা মহিলা এতগুণী হতে পারেন? তিনি কী জানতেন না! উর্দু ফারসী, হিন্দি, ইংরেজি সব ভাষাতেই তিনি সাবলীল ছিলেন। শুধু দৈনিক পত্রিকাই পড়তেন, তা নয়, তিনি ছিলেন উর্দু কবিতার পোকা। তার কাছেই প্রথম গালিব-মীরের কথা শুনেছি। কথায় কথায় চাচী মীরের গযল কোট করতেন। আহা, পৃথিবীতে আর কোনও নারীকে চাচীর মতো গুণী পাব কি না, সন্দেহ। এদিকে আব্বু বেজায় খুশি! আমার পড়ালেখার এমন অপ্রত্যাশিত সুযোগে। আসলাম চাচা খুশি, আমার উসীলায় তার মেয়ের লেখাপড়া ভালোভাবে এগুচ্ছে। চাচী খুশি, কবিতার এমন এক সমঝদার শ্রোতা পেয়ে।
.
রুবাবা পড়তে বসছে না দেখে, একদিন রাগ করে বলেছিলাম,
-তুমি পড়তে চাও না! অথচ প্রতিমা কী মনোযোগ দিয়েই-না পড়ে!

-প্রতিমা কৌন?
মেয়ে ছোট হলেও বুঝে গেছে, আমি আর কোনও মেয়ের কথা বলছি, তাকে আরেক মেয়ের সাথে তুলনা করেছি! তার কৌতূহল আর যায় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল। হিতে বিপরীত হল, যতই পড়তে বলি, সে গাল ফুলিয়ে বলে,
-পেহলে তো সবকুছ বাতাও সহি.........!
.
আজ কে কোথায়? চোখটা ভিজে ওঠে কেন? গলাটাও কেন ব্যাথা করে? বাড়ি আর কতদূর! বাড়ি এত দূরে কেন? পথ কেন ফুরোয় না? দীর্ঘদিন পর সুদূর থেকে ফিরলে কি গন্তব্যের পথগুলো এভাবে ক্রমাগত দীর্ঘ হতে থাকে? আমি কি অনন্তযাত্রার পথিক?
.
.

দিনলিপি-১২৪৮
(২৭-০৩-১৮)
দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (২)!
-
আমি দাদাকে যতটা কাছে থেকে লম্বা সময় জুড়ে পেয়েছিলাম, আর কাউকে তেমন করে পাইনি। দাদা ছিলেন জাতশিক্ষক। তার মধ্যে অনেক অবাক করা বিষয় ছিল। আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগত তার 'আসমানি আদালত'-এর থিউরিটা। আমরা কেউ দুষ্টুমি করলে, পাঠশালার কেউ অন্যায় করলে, তিনি সাথে সাথে তাকে ধরে মক্তবঘরে নিয়ে আসতেন। আদালত বসাতেন। একটা 'মজলিসে শুরা' গঠন করা ছিল। পাঠশালার বড় ও অভিজ্ঞ ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হতো শুরাকমিটি। কমিটির কাজ ছিল, প্রথমে দোষটা কী হয়েছে, সেটা জেরা করে, তদন্ত করে আনা। তারপর এই দোষের শাস্তির ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে সেটা খোঁজা। আগের বিচারগুলোর বিবরণ দেখে বা দাদাকে জিজ্ঞেস করে, উত্তর বের করার চেষ্টা করা হত। মাঝে মধ্যে দাদাও শরীয়ত থেকে সমাধান বের করতে পারতেন না। তখন আব্বু আসার অপেক্ষা করা হত।
দাদা পিতা হয়েও আব্বুর কাছ থেকে মাসয়ালা জেনে নিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা করতেন না। ভুল ধরা পড়লে, অবলীলায় মেনে নিতেন। কখনো তাকে ভুল ধরা পড়ার পর, মেনে

নিতে আমতা আমতা করতে দেখিনি। উল্টো ছেলে তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে, এটা তাকে আনন্দই দিত মনে হয়।

.

গ্রামে সালিশ ব্যবস্থা ছিল। দাদা সালিশের বিচারগুলোর ট্রায়াল ভার্শনও আমাদের আসমানি আদালতে করতেন। ইসলামি বিচারব্যবস্থা নিয়ে দাদার গভীর কৌতূহল ছিল। তিনি আলেম হলে ভাল একজন ফকী হতেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ দোষ না করলেও বা সত্যিকারের কোনও অপরাধী না থাকলে, দাদা বিকেলে আদালত বসাতেন। তিনি নিজে কল্পনা করে একটা অপরাধ দিতেন। তারপর জুরিবোর্ডকে বলতেন, এটার বিচার করো। কুরআনি আইন মেনে রায় দাও। ছাত্ররা আলাদত অনুষ্ঠান বেশ আনন্দের সাথে উপভোগ করত। মুসলমান তো বটেই, হিন্দু ছাত্ররাও সাগ্রহে বিচারকার্য দেখতে লেট্টা মেরে মাদুরে বসে যেত। বাড়ির মহিলারাও ঘরের পেছন দিক দিয়ে এসে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিচারকার্য অবলোকন করত। নিস্তরঙ্গ গ্রামীন জীবনে এটা সামান্য হলেও তরঙ্গ সৃষ্টিকারী ছিল বৈ কি। একদিন একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হত। বিচারপতি হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী থাকতে হত। পড়ালেখায় ভাল করা, নামাজ-কালামে যত্নবান হওয়া, মিথ্যা বলে কখনো ধরা খেয়েছে, এমন না হওয়া, আগের কেসগুলো হিস্ট্রি মুখস্থ থাকা।
জুরীবোর্ডে নির্বাচিত হওয়ার জন্যেও কিছু যোগ্যতা থাকতে হত। আমাদের পাঠশালায় একবছর পড়ার পর প্রতিটি ছাত্রের কুরআনি আইন ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা হয়ে যেত। অথচ এটা তাদের পাঠ্যসূচীতে ছিল না।
বেলামাসি আমাদের আসমানি আদলতকে বলতেন ‘আদালত নাটক’। তিনি প্রায়ই ‘নাটক’ দেখতে আসতেন। আমাকে দিয়ে দাদার কাছে প্রশ্ন পাঠাতেন। মাসি পড়াশোনা করা সচেতন মানুষ। নিয়মিত মাসিক পত্রিকা পড়েন। ডাকযোগে তার কাছে কয়েকটা পত্রিকা আসে। আসে মাসির পরিচিত আত্মীয়ের ফামের্সীতে। বাজারে। দাদা বা অন্য কেউ বাজারে গেলে আশীষ বাবু ডেকে পত্রিকাগুলো ধরিয়ে দিতেন। তিনি এমনি এমনি দিতেন না। আগে প্রতিটি পত্রিকা নিজের কাছে রেখে পড়তেন। তারপর দিতেন। কিছুদিন পর মাসি চিঠি লিখে পত্রিকা পাঠানোর ঠিকানা বদলে দিয়েছিলেন। নতুন ঠিকানা হল মাসির দুঃসম্পর্কের পিসে, প্রদীপবাবুর দোকান। তিনি আমাদের বাজারের একমাত্র হোমিও ডাক্তার ছিলেন। ঠিকানা কেন বদলানো হল, মাসির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, মাসি বলেছেন,

-মানুষ ভদ্রতার মুখোশ পরে, অভদ্র কাজ করলে, কিভাবে হয়? আমার পত্রিকা আসার জন্যে বাবুর দোকানের ঠিকানা ব্যবহার করলাম, তার বিনিময়ে তিনি পত্রিকাগুলো পড়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু বাবু তাতে খুশি নন। তাকে চিঠি লিখে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে? কেন রে? আমার সাথে তোমার কী? এখন বেশ হয়েছে। পিসেমশায় বুড়ো মানুষ। এই বয়েসে তার চিঠিপিঠি লেখার মতো ভীমরতি ধরবে না।

.

আমাদের আদালতে প্রতিদিনের কার্যবিবরণী লিখতে হত। এজন্য মুনশিও নিয়োগ করা থাকত। মুনশির দায়িত্ব পালাক্রমে বদল হত। এই দায়িত্ব পালন করতে করতে, একেকজনের হাতের লেখার যা উন্নতি হত না, বলার নয়। বানানও শুদ্ধ হয়ে যেত। লিখতে লিখতে সবার লেখনীশক্তিও বেড়ে যেত। স্কুলে রচনা লেখা আমাদের পাঠশালার ছাত্রদের কাছে ছিল ডালভাতের চেয়েও সহজ। এক আদালত দিয়েই, দাদা আমাদের মধ্যে কত রকমের যোগ্যতার চারাই না বুনে দিয়েছিলেন! এমন অজপাড়াগাঁয় থেকে, দাদার মাথায় এমন চিন্তা কী করে মাথায় এল? প্রশ্নটা আমার নয়, মাসির। মাসিও আড়াল থেকে আদালতের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার দায়িত্ব ছিল, কার্যবিবরণীর বানানের দিকটা দেখা। মাসির কাছে চলন্তিকা ও বড় বড় কয়েকটা অভিধান ছিল। তিনি শুধু বানানই দেখতেন না, ভাষাগত দিকটাও পরম যতেœ সম্পাদনা করে দিতেন। খাতার পাশে, গুটি গুটি অক্ষরে নোটও লিখে দিতেন!

আচ্ছা মাসি কি সেসব নোট দাদাকে দেখানোর জন্যে লিখতেন? কারণ মাসির কাছ থেকে দস্তাবেজ ফিরে আসার পর, দাদা পুনঃরিনীক্ষণ করতে বসতেন। তারপর সে দস্তাবেজ আমাদের হাতে সোপর্দ করা হত। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতাম, কি কি ভুল হয়েছে। মাসির নোটও সমধিক আগ্রহে পড়তাম। মাসির নোটগুলো সাধারণত ভাষা সংক্রান্ত হত।

.

প্রতিমা মায়ের সাথে থেকে থেকে ছোট বেলা থেকেই বইয়ের পোকা হয়ে উঠছিল। মাসি কিভাবে যেন কলকাতা থেকে বই আনাতেন। দেবসাহিত্যকুটিরের। আরও বিভিন্ন প্রকাশনীর শিশুতোষ বই। প্রতিমার জন্যে আনালেও, সে বই আমারও পড়ার সুযোগ হত। মাসির টাকার অভাব ছিল না। পাঠশালার মেয়েদেরকে পড়ানো বাবতও দাদা তার জন্যে একটা সম্মানী ধার্য করেছিলেন। দাদী আর আম্মুও সম্মানী পেতেন। দাদা বিনামূল্যে শ্রমগ্রহণে রাজি ছিলেন না। দাদী টাকা নিতে চাইতেন না, বলতেন,

-পড়িয়ে কেউ টাকা নেয়?

শুধু তাই নয়, পড়ানোর দায়িত্ব ছাড়া, দাদী আর আম্মুর জন্যে আরেকটা খাতেও দাদা সম্মানীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘরের কাজ করা বাবত। বিয়ের পর এ-বাড়িতে এসে, প্রথম মাসশেষে দাদা যখন আম্মুর হাতে টাকা তুলে দিতে গেলেন, আম্মু ভীষণ অবাক! এ কেমন কথা! আমি জীবনেও শুনিনি, ঘরের কাজ করে সম্মানী গ্রহন করতে। নিজের কাজ করেছি, টাকা দিতে হবে কেন!
দাদী বললেন,
-বৌমা, নিয়ে নাও। মানুষটা আমাকেও এতদিন টাকা দিয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম আমিও অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম। এমন ধারা বাপের জনমেও শুনিনি।
.
দাদার বক্তব্য পরিষ্কার,
-তোমরা ঘরের কাজ করছ। তোমাদের সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে। আর সাধ না থাক, তোমাদের হাতে কিছু দিতে পারলে, আমার ভাল লাগে। কুরআন কারীমেও এমন কিছু ইঙ্গিত আছে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। ভরণ-পোষণ মানে শুধু খাবার-পোষাকই নয়, সার্বিক। বৌমাও যেহেতু আমার দায়িত্বে আছে, তাই তাকেও আমার কিছু হাদিয়া দেয়া উচিত। পাশাপাশি আমি তোমাদেরকে এমনি এমনি দিচ্ছি না, তোমরা ঘরোয়া পাঠশালায় পড়াচ্ছ, সে বাবদও তোমাদের কিছু প্রাপ্য।
.
দাদার এমন আচরণে বেলামাসি ভীষণ প্রভাবিত হতেন। তিনি আমার সাথে এ-নিয়ে দীর্ঘ গল্প করতেন। কিশোরীবেলায় দাদা তাকে কিভাবে পড়িয়েছেন তার গল্প করতেন। স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি হওয়ার আগেও মাসি দাদার কাছে ঘরে পড়েছেন। মারও খেয়েছেন দাদার হাতে। মাঝেমধ্যে মনে হত, মাসি সুযোগ পেলে অনেক কিছু করতে পারতেন। তিনি কেন যে এভাবে পল্লী গাঁয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন! তিনি চাইলে বড় শহরে থাকতে পারতেন। কোলকাতা বা তার মামার বাড়ি বহরমপুরে চলে যেতে পারতেন। তার নানা থাকতেন শিয়ালদহে। সেখানে যেতে পারতেন। কোলকাতা থেকে অনেক ডাক এলেও, মাসি সাড়া দেননি। মাসি চাইলে লিখতে পারতেন, তাও করেননি। পড়ে পড়েই জীবন পার করে দিলেন। মাসি শিক্ষিকা হিশেবে খুবই দক্ষ ছিলেন। আম্মুও তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতেন।
.
আমি যখন ঘরের পাঠশালায় পড়াতাম, তখন মাসিও মাঝেমধ্যে বড় মেয়েদেরকে বাঙলা পড়াতেন। ফাঁকে ফাঁকে কিভাবে পড়াতে হবে আমাকে সেটা বলে দিতেন। তার কাছ

থেকে শেখা কৌশল আমার কাজে লেগেছে, ঢাকায় রুবাবাকে পড়াতে গিয়ে। কান্দাহারেও আমাকে মক্তব পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিভাবে যেন আমাকে দেখলে সবার নাকি ধারনা হতো, আমি ভাল পড়াতে পারব। প্রথম দিকে রুবাবা অমনোযোগী থাকলেও, যখন থেকে যৌথ পাঠ শুরু হল, সে আস্তে আস্তে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হতে করল। বয়েসও বাড়ছিল। বুঝও হচ্ছিল। কিন্তু কথা বলায় পেয়ে বসলে, তাকে থামানো যেত না। সেই আগের মতোই চপল হয়ে পড়ত।

.

বেলামাসি একবার অনেক বলেকয়ে, আমাকে তার শ^শুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাদা রাজি ছিলেন না। মাসি কিভাবে যেন আম্মুকে ‘পড়িয়ে’ ফেলেছিলেন। আম্মু বলেকয়ে দাদাকে সম্মত করেছিলেন। মাসি শ^শুর বাড়িতে সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে, সেজন্য তাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আর শ^শুর-শাশুড়ির ইচ্ছে, নাতি-নাতকুরকে শেষবারের মতো দেখে যাবেন। যাওয়ার আগে সম্পদের একটা বিলিব্যবস্থা করে যেতে না পারলে, নিষ্ঠার সাথে তীর্থসুখ উপভোগ করতে পারবেন না। ওপারের এক মুসলিম পরিবারের সাথে কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। তারা এপারে এসে এ-বাড়িতে উঠবে, প্রতিমার দাদা-দাদু আর কাকারা ওপারের মুসলিম বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। মেলামাসি যেহেতু ওপারে যাবে না, তাই তার স্বামীর প্রাপ্য অংশ বিক্রি করে, তার হাতে টাকা তুলে দেয়া হবে। এ উপলক্ষ্যে প্রতিমাদের পিতৃকুলের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন জড়ো হবে হরিপুরে।

.

সেবারই প্রথম চোখ খুলে বাইরের সম্পূর্ণ আলাদা এক পৃথিবী দেখেছিলাম। আমাদের গ্রামেও অনেক হিন্দু পরিবারের বাস ছিল। প্রতিবেশি হিশেবে তাদেরকে দেখতাম। কিন্তু এভাবে তাদের সদর পেরিয়ে আন্দরের গভীরে ঢোকা হত না। খেলার সাথি ছিল, তাদের সাথে ঘটিবাটি খেলা হত, এটুকুই। প্রতিমার দাদাবাড়ি এসে অন্য এক জগতের সাথে পরিচয় ঘটল। তাদের পূজোআচ্চা একান্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল। মাসি আমাকে সব থেকে সযতেœ দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন! তবুও ফাঁকফোকর গলে যা দেখা হয়েছে, তাও কম নয়। প্রতিমার কাকা-পিসিরা আমাদের দেখে অবাক। মোছলমান ছেলে তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, এটা নিয়ে তাদের কৌতূহলের শেষ ছিল না। সবাই আমাকে খুবই আদর করত। আমাকে গল্প দিয়ে, পাড়া বেড়িয়ে খুশি রাখতে চাইত। পুকুরে ভেলা ভাসিয়ে মাছ ধরার সময়, আর কাউকে না ওঠালেও আমাকে উঠিয়ে নিত। ছেলেবেলার গ্রামদেশের সে এক দুর্লভ সম্মান। ম্লেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে দেয়নি। অবজ্ঞাও করে নি। তখনও গ্রামদেশের বুড়োবুড়িরা নিজেদের মধ্যে, মুসলমানদেরকে যবন বলে

ডাকত। এটা গালির মতোই ছিল। নিজ কানে কখনো অবশ্য এই ডাক শোনার সুযোগ হয়নি।

.

সীমানা পেরিয়েও অনেকে এসেছিলেন, সেই বিদায়ী অনুষ্ঠানে। মাসির শ^শুর বাড়ির অদূরেই ছিল এক বিখ্যাত মহিলা অভিনেত্রির বাড়ি। যার নামের শেষে ‘সেন’ আছে। মিস সেন সম্পর্কে মাসির স্বামীর খুড়তুতো বোন। মাসির শ^শুর বাড়ি ছিল ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে। এই গ্রামে আরও অনেক বিখ্যাত পরিবারের নিবাস ছিল। খুড়তুতো ননদের মতো মাসির স্বামীদেরও পাবনা শহরে নিজের বাড়ি ছিল। গ্রাম আর শহর মিলেই মাসির স্বামীরা বাস করতেন। মাসির সাথে অবশ্য মিস সেনের দেখা হয়নি। মিস সেনের বিয়ে হয় নবম শ্রেণীতে পড়াকালে। ১৯৪৭ সালে। বিয়ের পরপরই তিনি স্বামীর সাথে কলকাতায় চলে যায়। মিস সেনের বাবা এপার বাঙলায় থেকে দিয়েছিলেন। তিনি পৌরসভার স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন। দেশভাগের পরও, পাকিস্তান সরকারের অধীনে নির্বিঘেœ সরকারি চাকুরি করেছেন। অবসর নিয়েছেন ১৯৫১ সালে। অবসরের পরও তিনি পাবনায় ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি দেশত্যাগ করেন।

.

মিস সেনের পিতা করুণাময় দাশগুপ্তের সাথে, মাসির শ^শুরপক্ষীয় অনেক আত্মীয়স্বজনও দেশত্যাগ করেন। আজ জমিজমা ভাগ-বাঁটোয়ারাতে তারা সীমানা পেরিয়ে এসেছেন। হয়তো শেষবারের মতো। স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি ভাগ হওয়ার পর, যে যার পথে পা বাড়াল। মাসি তার দুই সন্তান নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ট্রেনে চড়ে বসলেন। প্রায় সব আত্মীয়-স্বজনই তাকে বিদায় দিতে স্টেশনে এসেছিলেন। মাসির শ্বশুর-শাশুড়ি অনেক চেষ্টা করেছেন, তাদের সাথে দুই এতীম নাতি-নাতনিকে নিয়ে যেতে। মাসি রাজি হননি। কলকাতায় ভালো স্কুলে রেখে পড়ানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন তারা। মাসি কী বুঝে রাজি হননি কে জানে! একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করার পর, মাসির এক দেবর এসেছিলেন। মাসিদেরকে নিয়ে যেতে। অনেক জোরাজুরির পর, মাসি শুধু ছেলেকে যেতে দিয়েছিলেন। তাও যুদ্ধ শেষ হলে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার শর্তে। মেয়েকে রেখে দিয়েছিলেন। ওপারে যেতে দেননি। মাসি বোধ হয় চাইতেন, মেয়ে তার কাছছাড়া না হোক। আর ছেলেও ওপারে যেতে বেজায় আগ্রহী ছিল। তা দেখে চাচী আর অমত করেননি।

.

.

.

যুদ্ধ কারো জন্যে ভাঙ্গার কারো জন্যে গড়ার। অবাক করা ব্যাপার হল, আফগান জিহাদ আমার জন্যে জীবন গড়ার হলেও, বাংলাদেশের যুদ্ধ আমার জন্যে ব্যক্তিজীবনের জন্যে 'ভাঙ্গার' হয়ে গেছে। ঢাকাতে ও গ্রামের বাড়িতে উভয় দিকেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক আপনজনকে হারাতে হয়েছে। সে হারানোর চাপ এত বেশি ছিল, আল্লাহর রাস্তায় বের হতে না পারলে, আমার মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়াও বিচিত্র ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরিস্থিতি এতই ঘোলাটে আর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, গ্রামের বাড়িতে আসাটা আমার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আম্মু, দাদা-দাদু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক'দিন থাকা যায়?

.

আমার হেফযের খতম শোনানো হয়ে গিয়েছিল বছরের মাঝামাঝিতে। আব্বু আর আসলাম চাচ্চু মিলে ঠিক করলেন, বছরের বাকি সময়টুকু আমি চাচীর কাছে উর্দু-ইংরেজী শিখব পাশাপাশি রুবাবাকে কুরআন কারীম পড়াব। আর সময় সুযোগ করে আব্বু আমাকে আর রুবাবাকে আরবী পড়াবেন। আসলাম চাচ্চুর ভাগে পড়ল, আমাদেরকে নাহু-সারফ পড়ানোর। আব্বু আর চাচ্চু তাদের তুমুল ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের দু'জনকে নিয়ে বসতেন। বেলামাসির কাছে এক ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলাম। ঢাকায় এসে লুবাবা চাচীর কাছে পেতে শুরু করলাম আরেক ধরনের শিক্ষা। মাসির কাছে পেয়েছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ। বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির পাঠ। বাংলাদেশের ইতিহাস। কলকাতার ইতিহাস। ঢাকার ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস। মাসি ইংরেজীতে অতটা পারদর্শী ছিলেন না। তার মানে একদম অজ্ঞ ছিলেন এমন নয়। শত হলেও দাদার ছাত্রী। মৌলিক জ্ঞান ছিল প্রখর। ইংরেজির চর্চা না থাকাতে হয়তো একটু পুরনো জ্ঞানে একটু মরচে ধরেছিল। আমাদের ঘরোয়া পাঠশালায় মেয়েদের ইংরেজীটা তিনিই দেখতেন। এই কাজ করার মতো আর কেউ ছিল না। দাদু আর আম্মু ইংরেজী পারতেন না। দাদা বড় মেয়েদেরকে পড়াতেন না। এটা ছিল একান্তই মাসির এলাকা। কোনও বিষয়ে আটকে গেলে, মাসি দাদার কাছে প্রশ্ন পাঠাতেন। কখনো লিখে, কখনো আমাকে বাহক বানিয়ে। মাসির প্রশ্নের উত্তর বহন করতে করতেও ইংরেজি গ্রামারের অনেক জটিল বিষয় আমার শেখা হয়েছিল। দাদাকেও দেখতাম অনেক সময় মাসির প্রশ্নে উত্তর খুঁজতে বইপত্র ঘাঁটতে। এ-বিষয়টা দাদা বেশ উপভোগ করতেন। বইপত্র ঘেঁটে উত্তর বের করা ছিল দাদার অত্যন্ত প্রিয় কাজ। মাসির কাছ থেকে কোনও প্রশ্ন এলেই দাদা সাগ্রহে বসে যেতেন উত্তর লিখতে বা আমাকে উত্তরটা শেখাতে। মাসি সম্পর্কে দাদার আগ্রহ শুধু

লেখাপড়া বিষয়ক প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকত। মাসির অন্য কোনও বিষয়ে দাদার তেমন কোনও আগ্রহ দেখিনি।

.

লুবাবা চাচীর কাছে পেয়েছি ভারতে মুসলমানদের ইতিহাসের পাঠ। শুধু পাঠ নয়, গভীর পাঠ। গল্পের মতো করে চাচী চমৎকার উর্দুতে ইতিহাস শোনাতেন। একটু পরপরই ঘুরে ফিরে তার গল্পে লক্ষেèৌ আর হাযদারাবাদের গল্প উঠে আসত। চাচী লক্ষেèৌ আর হায়দারাবাদকে কী যে ভালোবাসতেন, বলে বোঝানো যাবে না। চাচী চেষ্টা করছিলেন দ্রুত বাংলা শিখতে। যাতে আমার সাথে কথা বলতে পারেন। আমি চেষ্টা করছিলাম দ্রুত উর্দু শিখতে, যাতে রুবাবার সাথে ইচ্ছামতো গল্প করতে পারি। চাচী গল্প করতে যেমন ভালোবাসতেন, গল্প শুনতে আরও বেশি ভালোবাসতেন। তিনি থাকতেন একা। আমিই ছিলাম তার জন্যে মুক্ত বাতায়ন। বেড়ে উঠেছেন লক্ষ্ণৌ হায়দারাবাদের অভিজাত পরিবেশে। শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা খান্দানী মেজায আর নবাবী ভাবধারায়। চাচীর মধ্যে সহজাত এক শারাফ (আভিজাত্য) ছিল, দেখা বা কথা বলার সাথে সাথেই ধরা পড়ে। চাচার মতো একজন মাওলানার সাথে চাচীর মতো এমন 'প্রিন্সেস'-এর বিয়েটা কিভাবে হল? চাচি মিষ্টি করে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,
-বেটা, সবকুচ বাতাওঙ্গি!

.

গল্প করতে করতে দাদার কথা আসত, আম্মুর কথা আসত। মাসির কথা আসত। প্রতিমার কথা আসত। মাসির কথা শুনতে শুনতে চাচী বেজায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। প্রতিমার কথা শুনে রুবাবা কৌতূহলী। চাচীর ধারনা ছিল বাংগালি হিন্দু মেয়েরা শুধু পুঁথি-টুঁথি পড়ে। গানটান গায়, নাটক থিয়েটার করে। তেমন গভীর পড়াশোনা করে না। মাসির কথা শুনে তার টনক নড়ল। আর দাদার কথা শুনে তিনি রীতিমতো তাজ্জব! এত গুণীও কোনও মানুষ হতে পারে? প্রায়ই তিনি অবাক হয়ে প্রশ্নটা করতেন! তিনি স্থির করে ফেললেন, যে করেই হোক, তিনি মাসি ও দাদাকে একবার হলেও দেখবেন। আর আম্মুর সাথে দেখা করতে চাইতেন, আম্মুর সাথে নাকি তার একটা গোপন কথা আছে। সেটা শুধু আম্মুকেই বলবেন, আর কাউকে বলা যাবে না। আসলাম চাচ্চুর কাছে শুনেছেন, বাংলাদেশের গ্রামগুলো বেশি সুন্দর। চারদিক ঘন সবুজ আর নদীনালায় ভরা। বাংলাদেশের গ্রাম দেখারও ইচ্ছা। সবমিলিয়ে ঠিক হলো চাচী আর রুবাবা কিছুদিনের জন্যে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন।

দিনলিপি-১৪৩১
(২৯-০৯-২০১৮)
দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (৩)!
-
পরামর্শ করে ঠিক হল, আগে দাদু আর আম্মু আসবেন ঢাকায়। দাদুর চিকিৎসার প্রয়োজন। সাথে আম্মু থাকলে ভালো হয়, তাই আম্মুও এলেন। আম্মু যখন আসছেন, সাথে একজন ন্যাওটাও জুটল। প্রতিমা বায়না ধরল সেও 'মাসির' সাথে ঢাকা আসবে। প্রতিমা আসবে শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হল রুবাবা। তার ভীষণ কৌতূহল প্রতিমার প্রতি। আমি তাকে পড়াতে গিয়ে প্রতিমার তুলনা দেই, এটা তার আত্মসম্মানে লাগে বোধ হয়। আম্মু আর দাদু তাদের ন্যাওটাকে নিয়ে ঢাকায় এলেন। উঠলেন আসলাম চাচ্চুর বাসায়। আসলাম চাচ্চু ঢাকায় এসে অল্পদিনেই বেশি জমিয়ে তুলেছিলেন তার ব্যবসা। তিনি জাত ব্যবসায়ী ছিলেন। যেখানেই হাত দেন, সোনা ফলে। ঢাকার বিখ্যাত একটি পেট্রোলপাম্প তার মালিকানায় ছিল। এবং বর্তমানে তেজগাঁওয়ে নাবিস্কো মোড়ের পাশে বিশাল জায়গা ছিল তার মালিকানায়। যুদ্ধের সময় সবকিছু জলের দরে বিকিয়ে দিতে হয়। বিক্রি না করে উপায় ছিল না। চারদিকে সবাই বিহারীদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল। অথচ আসলাম চাচ্চু নিজেকে বাংলাদেশি ভাবতেই পছন্দ করতেন। তিনি উর্দুভাষী হলেও, এই দেশকে ভালোবাসতেন। পশ্চিম পাকিস্তানীদের হামবড়া ভাব আর নাক উঁচু স্বভাবকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিহারীদেরকেও অবজ্ঞার চোখে দেখত। চাচ্চু চাইলে, পশ্চিমে গিয়ে ভালো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারতেন। পাকিস্তানের অনেক বড় ব্যক্তির সাথে লুবাবা চাচীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা দুই কর্তার সাথেও চাচীর পারিবারিক সংযোগ ছিল। তার দাদাজির সূত্রে। দিল্লিতে দৈনিক ঝং আর ডনে কাজ করার সময়, দাদাজির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে জিন্নাহ ও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সাথে। দেশ ভাগের পর, দু'জনেই দাদাজিকে বলেছিলেন হিজরত করে পাকিস্তানে চলে যেতে। তিনি রাজি হননি। হায়দারাবাদের প্রাচীন সুবাস সকাল-বিকাল নাকে না লাগাতে পারলে নাকি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন।
.
.
বেলামাসি আমাকে তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আম্মুও বোধ হয় তার প্রতিদান দিয়ে চেয়েছেন প্রতিমাকে ঢাকায় নিয়ে এসে। মাসি প্রস্তাবটা শুনেই রাজি।

মেয়ের জন্যে এটা বড় এক সুযোগ। এত ছোটকালেই ঢাকা দেখার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। মাসির মনে ক্ষীণ একটা ইচ্ছা ছিল, তিনি প্রতিমাকে নিয়ে একবার কলকাতা ঘুরে আসবেন। পথসঙ্গী না পেয়ে, একা একা পা বাড়াতে সাহস করেননি। আর দাদাজিও তার যাওয়াটা সমর্থন করেননি। মাসি দাদুকে দিয়ে প্রস্তাবটা পেড়েছিলেন। দাদা শোনার সাথে সাথেই বলেছেন,
-ওর বুঝি এখানে আর মন টিকছে না! তাহলে সরাসরি বললেই পারে।
মাসি এরপর থেকে চুপ। এ-বিষয়ে আর একটি কথাও বলেননি।
দাদাভাইয়ের প্রতি মাসির এমন অচল বিশ্বাস আনুগত্য আর আস্থা দেখে অবাক লাগতো। পৃথিবী একদিকে, মাসির কাছে তার গুরুমশাই আরেক দিকে।
.
.
প্রতিমাকে দেখে, রুবাবা অবাক! কেমন পুতুল পুতুল চেহারা। আমি ছাড়া রুবাবার আর কোনও সঙ্গী ছিল না। মেহমান এলেও রুবাবার কুরআন পাঠ বন্ধ থাকল না। আমরা কুরআন পড়ার সময় প্রতিমা একপাশে চুপটি করে বসে থাকত। রুবাবার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না, একটা মেয়ে এত শান্তশিষ্ট কিভাবে হয়। কথা কম বলে। চিৎকার চেঁচামেচি করে না, খেলতে বসেও উচ্চবাচ্য করে না, এ কেমন মেয়ে? খেলায় জিতলে অতিরিক্ত কোনও উচ্ছ্বাস নেই, হারলে তেমন কোনও আফসোস নেই। রুবাবা গুটি খেলায় হেরে গিয়ে মন খারাপ করলে, প্রতিমার মনও যেন খারাপ হয়ে যায়। খেলায় জিতেছে বলে আফসোসের সীমা থাকে না। রুবাবার প্রতি প্রতিমার একটা মুগ্ধতা ছিল। গটগট উর্দু ইংরেজী পত্রিকা পড়তে পারে, আবার কুরআন কারীম মুখস্থ করা শুরু করেছে, এতকিছু যে পারে, সে সাধারণ কেউ নয়। আমরা যখন পত্রিকা পড়তে বসতাম, প্রতিমা গুটি গুটি কাছে এসে বসত। গভীর আগ্রহে আমাদের পড়া দেখত। ইংরেজী পড়ার সময় তার চোখ উজ¦ল হয়ে উঠত। এটা সে অল্প অল্প পারত। রুবাবা এবার মাস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রতিমাকে বানান করে করে ইংরেজী পড়ায়। অর্থ বোঝায়। সমস্যা হল, প্রতিমা উর্দু বোঝে না। তবুও রুবাবাকে দমায় সাধ্যি কার! রুবাবার সাথে সাথে থেকে প্রতিমা নিত্য নতুন বিষয় শিখতে লাগল।
.
দাদুর চিকিৎসা শেষ। এবার বাড়ি ফেরার পালা। লুবাবা চাচিও আমাদের সাথে যাবেন। কিছুদিন বাঙলাদেশের গ্রামীণ জীবন দেখে আসবেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে দেশে। কখন কী হয় বলা যায় না। চাচী আমাদের বাড়িতে এসে ভীষণ উচ্ছ্বসিত। তিনি

আগে কখনো এত সুন্দর তালাব (পুকুর) দেখেননি। যাই দেখেন, তাই তার ভালো লাগে। আজীবন শহরে মানুষ হয়েছেন। বিহারে কিছুদিন গ্রামে থাকলেও, বিহার বাঙলাদেশের মতো এত সুন্দর নয়।

.

চাচী ফিরে গেলেন। তার যাওয়ার কিছুদিন পরই পাকিস্তানী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলাদেশের উপর। শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধ। দেশের এমাথা ওমাথায় ছড়িয়ে পড়ল পাকসেনারা। যুদ্ধের প্রথম দিকে ঢাকায় বিহারীদের অবস্থা বেশ ভালো ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি যতই মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে যাচ্ছিল,ততই ঢাকায় বিহারীদের অবস্থা নড়বড়ে হতে শুরু করল। আসলাম চাচ্চু বিহারী হলেও, তিনি বিহারী পাড়ায় থাকতেন না। বাঙালিদের সাথেই তার সমস্ত কায়-কারবার ছিল। তবুও গ্রামের মতো ঢাকাতেও একদল দেশপ্রেমিক দাঁড়িয়ে গেল। তারা পাড়ায় পাড়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে উর্দুভাষী বের করে, তাদেরকে হেনস্থা অপদস্থ করতে শুরু করল। বাসাবাড়ি লুঠ করা আরম্ভ করল। শুধু সম্পদ নিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না, সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলাও তাদের কর্মতালিকাভুক্ত হল। অবিবাহিতা মেয়েদের সাথে দুর্ব্যবহারের মাত্রা বেড়েই চলল। রুবাবা এখনো কিশোরী। বিয়ের বয়েসে পৌঁছেনি। তবুও চাচাজি মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চাচাজির অফিসে গিয়ে কয়েকজন খোঁজ-খবর করে এসেছে। এখানে সেখানে উর্দুভাষীদের সহায়-সম্পত্তি লুন্ঠন হতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও জোর করেও সম্পত্তি দখলে নিয়ে নেয়া হচ্ছে। শুধু শক্তিবলে দখল নয়, কাগজপত্র করে বৈধভাবে দখল। নামমাত্র টাকা ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার ধারে কাছেও যাচ্ছে না। দল বেঁধে এসে বলছে, এই বাড়ি বা এই কারখানা এখন থেকে আমাদের। ব্যস, দখল হয়ে গেল। চাচা পরামর্শ করতে বসলেন আব্বুর সাথে। তারা দু'জনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমার আর রুবাবার বিয়ের আকদ করে রাখবেন। আর সম্পত্তি সব হাতছাড়া হওয়ার আগে, নামমাত্র যা মূল্য পাওয়া যায়, বিক্রি করে ফেলবেন। অবস্থা আরও খারাপ হলে, সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আপাতত বিহারে বা হায়দারাবাদে চলে যাবেন।

.

আমাদের বিয়েতে চাচীর আপত্তি না থাকলেও, এত তাড়াতাড়ি বিয়েতে আপত্তি করলেন। অবস্থা ও পরিস্থিতি শান্ত হলে, পরেও আকদ রুসমত করা যাবে। চাচা বললেন,
-এখন মেয়েকে বাঁচানো নিয়ে প্রশ্ন। বিয়েটা হয়ে গেলে, বলা যাবে, সে বিবাহিতা। তার স্বামী একজন বাঙালি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব,এদেশ ছেড়ে না যেতে। নিতান্ত বাধ্য না হলে, সীমান্ত পাড়ি দেবো না।

.
চাচী আর কথা বাড়াননি। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিয়েটা হয়ে গেল। বাড়ির কাওকেও জানানোর সুযোগ হল না। আব্বু আর চাচ্চুর সিদ্ধান্তটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর থেকে দুষ্টলোকদের আনাগোনা কমেছে। তবে সম্পত্তি বোধ হয় বাঁচানো সম্ভব হবে না। চাচ্চুকে বাঁচাতে গিয়ে, আব্বুও রোষানলে পড়লেন। ঢাকার পরিস্থিতি দিনদিন অবনতি ঘটতে লাগল। আব্বু খুঁজে গ্রাহক সংগ্রহ করলেন। বহুমূল্য সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়ে গেল। কিছু সম্পত্তি এমনি এমনি বেদখল হয়ে গেল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ হারানোর মানে হয় না। এদিকে স্বার্থান্বেষী লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেল। বিহারীদের উপর নেমে এল চরম নির্যাতন। যুদ্ধের শুরুতে বিহারীরা বাঙালিদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, যুদ্ধের শেষে তাদের উপর সেটা ফেরত আসতে লাগল। চাচ্চুকে আগলে রাখতে গিয়ে, আব্বু মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বলে চিনহিত হয়ে গেলেন। আব্বুকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হল। কয়েকদিন পর একদল যুবক আব্বুকে আবার ডেকে নিল। তারা বলল,
-আপনাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি একটা শর্তে। আপনি ওই বিহারী লোকটার টাকাপয়সা আমাদের দিয়ে দেবেন। এর বিপরীত হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। আর লোকটা যেন পালাতে না পারে।
.
আব্বু বুঝতে পারলেন, শুধু চাচা নয় তার পক্ষেও ঢাকায় থাকায় নিরাপদ নয়। সব জানতে পেরে চাচ্চু বললেন,
-তোমাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়ে, আমি কোথাও যাবো না।
আব্বু চাচ্চুর কথা মানলেন না। তিনি খবর পেয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই চাচ্চুর বাড়িতে চড়াও হবে তারা। আর দেরী না করে, আব্বু এক প্রকার জোর করেই চাচ্চুদেরকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজে সাথে গিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দিলেন। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে। আব্বুও গ্রামের বাড়িতে চলে যেতেন। কয়েকটা কাজ বাকি থাকাতে ঢাকার বাসায় ফিরে এলেন। সেটাই ছিল আব্বুর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। রাতের বেলা একদল যুবক এসে আব্বুকে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল। আর কখনো ফিরে আসেননি।
.
নিরুদ্দেশ হওয়ার আগের রাতে, আব্বু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসলাম চাচ্চুকে ঢাকার বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। সাথে একজন বিশ^স্ত লোককেও দিয়েছিলেন। নিরাপদ

পথে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। চাচ্চু কথা দিয়েছিলেন, যুদ্ধের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, আবার ফিরে আসবেন। নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করবেন। একটি সংসার শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল। আব্বুর সেই বিশ^স্ত লোকটির সাথে দেখা হয়েছিল পরে। তিনি বলেছিলেন, পুরো পথ জুড়ে রুবাবা একটানা কেঁদে গেছে। লুবাবা চাচীর শত সান্ত¡নাতেও তার কান্না থামেনি। লুবাবা কিশোরী হলেও, বুঝসমঝ তুলনামূলক বেশি ছিল।

.

আমরা বাড়িতে সবাই আব্বুর জন্যে অপেক্ষা করে আছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আব্বুর কোনও খবর নেই। দাদাভাই অসুস্থ, তাই নিজে ঢাকা আসতে পারলেন না। গ্রামের একজন লোককে পাঠালেন। সেও কোনও খোঁজ আনতে পারল না। দাদাভাই আরও ভেঙে পড়লেন। কিন্তু সংসারের হাল ধরতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব আবার দাদাভাইয়ের কাঁধে এসে চেপেছে।

.

যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন দাদা ঘরোয়া পাঠশালায় হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু অতি উৎসাহী সমর্থক ব্যাপারটা সুনজরে দেখল না। তারা চাচ্ছিলো যুদ্ধের সুযোগে হিন্দুদের ঘরদোর দখল করে নেবে। আরও বাড়তি সুবিধা নেবে। দাদা তাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। তাই ভেতরে ভেতরে পশ্চিমাপন্থীরা ফুঁসছিল। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঘরে আশ্রয় দেয়াকে কেন্দ্র করে, সুযোগসন্ধানীরা তাদের জোট পাকিয়ে তুলল। তারা প্রথমে দাবী তুলল, এই ছাত্র-ছাত্রীদের বের করে দিতে হবে। তারা তাদের নিজ নিজ ঘরবাড়িতে ফিরে যাক। মুসলিম পাড়ায় কোনও হিন্দু থাকতে পারবে না। হিন্দুরা একদিকে থাকবে, মুসলমানরা আরেক দিকে থাকবে। দাদা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি নিজের অবস্থানে অটল রইলেন। বিরোধীদের নেতাদের সাফ জানিয়ে দিলেন,

-তোমরা যদি ইসলামের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের ভিটেমাটি ছাড়া করতে চাও, তাহলে আমিও ইসলামের দোহাই দিয়ে, তাদেরকে আমার ভিটেমাটিতে আশ্রয় দিতে পারি! তোমরা চাইলে আমি আমার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল দিতে পারি। হুজুরের কাছ থেকে ফতোয়া এনে দিতে পারি!

দাদাভাইয়ের শক্ত অবস্থান দেখে, স্বার্থান্বেষী মহল আপাতত পিছু হটে গেল। কিন্তু ঘোঁট পাকানো অব্যাহত রাখল। যুদ্ধ কবলিত দেশে মূল্যবোধের দ্রুত অবনতি ঘটে। যে দাদাকে আশেপাশের দশ গাঁয়ের মানুষ সম্মান করত, যুদ্ধের ধাক্কায় সে সম্মান উবে যেতে বসল।

গ্রামে শান্তি কমিটি গঠিত হল। এলাকার হর্তাকর্তা সবাই দাওয়াত পেলেও, বিচিত্র কারণে দাদাকে বৈঠকে ডাকা হল না। এই প্রথম দাদাছাড়া গ্রামে কোনও বৈঠক হল। দাদার কানে বৈঠকের খবর ঠিকই পৌঁছল। তিনি বিচলিত না হলেও কিছুটা চিন্তিত হলেন। দিনকাল বদলাচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু সঠিক করণীয় কি, সেটা ঠিক করতে পারছিলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে, হিন্দু পরিবারগুলো আস্তে আস্তে সীমান্তের ওপারে পাড়ি জমাতে শুরু করল। ঘরোয়া স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হু হু করে কমতে লাগল। চারদিকে জমাট গুমোট ভাব। বিভিন্ন এলাকা থেকে হিন্দুবাড়ি লুঠতরাজের সংবাদ আসছে। দাদাভাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে শুরু করলেন।

.

এখন আমাদের বাড়িতে আর কোনও হিন্দু ছাত্র নেই। সবাই যে যার বাড়িতে চলে গেছে। আশেপাশের গ্রামগুলোতে, হিন্দু বসতিতে পাকসেনারা রেইড দিচ্ছে। একদিন দাদাভাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, বাড়ির সামনে দিয়ে শান্তি কমিটির লোকজনের আসা-যাওয়ার মাত্রা বেড়ে গেছে। মাসিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারছেন, খুব দ্রুত কিছু একটা করতে হবে। মাসিকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে। দেরী করা যাবে না। পারলে আজ রাতেই।

দাদাভাই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ পেলেন না। সন্ধ্যা নেমে আসতেই, একগাড়ি পাকসেনা এল আমাদের পাড়ায়। গ্রামে এর আগে কখনো ইঞ্জিনের গাড়ি এসেছে বলে জানা নেই। সেই প্রথম গাড়ি আসা। রাতের নিরবতা ভেঙে খানখান করে বেজে উঠল গাড়ির হরণ। মিলিটারি গাড়ি আমাদের বাড়ি পেরিয়ে মাসিদের বাড়ির দিকে চলে গেল। দাদাভাই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে কোনাকুনি পথে মাসির বাড়ির দিকে গেলেন। যাওয়ার আগে, কী বুঝে দাদুকে বলে গেলেন,

-যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়, তাহলে বেলাকে বলো, আর ছেলেমানুষি না করে, তোমার কাছে কালিমা পড়ে নিতে!

গাড়ি পৌঁছার আগেই দাদা মাসিদের বাড়ির সদরে পৌঁছে গেলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাড়ি থেকে এক তরুণ অফিসার নামল। দাদা নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। অফিসার গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান গদগদ ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। অফিসার সৈনিকদের হুকুম দিল, বাড়ির অন্দরে যেতে। দাদা অগ্রসর হয়ে বললেন,

-এই বাড়িতে একজন মহিলা থাকে তার বাচ্চাসহ!

-আমার কাছে পাকা খবর আছে, এই বাড়িতে মুক্তিফৌজ লুকিয়ে আছে। মুক্তিসেনারা এ-বাড়িয়ে এসে রাতযাপন করে।
-অসম্ভব! ডাহা মিথ্যে কথা!
-আচ্ছা, সেটা খানাতল্লাশীর পর নিশ্চিত করে বলা যাবে!
-ঠিক আছে, চলুন!
-আপনি কোথায় যাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর কাজের সময় আপনি সিভিলিয়ান কোন অধিকারে উপস্থিত থাকবেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান!
.
দাদাভাইর অফিসারের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াননি। অফিসার একজন সেপাইকে নির্দেশ দিল, দাদাভাইকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। দাদাভাইকে ধরতে আসতেই ক্ষেপে গেলেন। শুরু হল ধস্তাধস্তি। খালি হাতে দাদাভাই দু'জনে সেনাকে ধরাশায়ী করলেন। আরও কয়েকজন সেনা এসে দাদাভাইকে ধরলো। অফিসারের হুকুমে দাদাকে বেঁধে গাড়িতে তোলার উপক্রম হতেই ভেতর বাড়ি থেকে বেলামাসি উদ্যত বটি হাতে যেন উড়ে এলেন। অফিসার মাসির রণমূর্তি দেখে ভড়কে গেল। ফায়ারের অর্ডার দিল। একসাথে দু'জন সেনা গুলি করল। মাসি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। অফিসার কী বুঝে দাদাকে নিয়ে চলে গেল। মাসির বাড়ি আর তল্লাশী করল না। সেনারা চলে যেতেই দাদু পাগলের মতো দৌড়ে এসে মাসিকে জড়িয়ে ধরলেন। আরও কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেলেন। মাসি বুদ্ধি করে আগেই প্রতিমাকে আমাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাসির তখন মুমূর্ষ অবস্থা। দুই পায়ে গুলি লেগেছে। বুকের একপাশে গুলি লেগেছে। দ্রুত হাসপাতালে নিতে পারলে, হয়তো বেঁচে যেতেন। কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। দাদাভাই নেই। গাড়ির বন্দোবস্ত নেই। শত চেষ্টাতেও মাসির রক্তক্ষরণ থামানো গেল না। হুঁশ আসছিল আর যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে দাদু সবাইকে কামরা থেকে বের করে দিলেন। তারপর দাদাভাইয়ের শেষ কথাটা মাসিকে বললেন। মাসি এমন কাতর অবস্থাতেও স্মিত হেসে বললেন,
-গুরুমশায় কি তাহলে আগে থেকেই কিছু একটার আশংকা করেছিলেন? ঠিক আছে, আপনাকে গুরুমশায় যা করতে বলেছেন, তা পালন করুন। আমি আর ছেলেমানুষি করব না। তবে তিনি কথা রাখেননি! আমি আমার কথা রেখেই ইহজগত ত্যাগ করছি।
.
মাসি মধ্যরাতে মারা গিয়েছিলেন। শান্তি কমিটির দাপটে, গ্রামের কোনও পুরুষ এ-বাড়ির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কেউ একজন স্টেশনে গিয়ে, কিভাবে যেন, ঢাকায় আব্বুর

কাছে খবর পাঠিয়েছিল। আব্বু সাথে সাথে আসলাম চাচ্চুকে দিয়ে কোথায় কোথায় যেন ফোন করিয়ে, দাদাজির মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সারারাত আর পরদিন দুপুর পর্যন্ত বৃদ্ধ দাদাজির উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। দাদাজি আসরের পর গরুর গাড়িতে করে ঘরে ফিরলেন। গাড়োয়ান আর আরেকজনের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। হাঁটতে পারছিলেন না। একরাতেই দাদাভাই একেবারে অর্ধমৃত হয়ে গেছিলেন। তারপরও বৈঠকখানায় বসেই বললেন,
-আমার জন্যে গোসলের ব্যবস্থা করো। কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছে। সেগুলো আগে আদায় করি। তারপর অন্য কাজ।
দাদাজি নামায পড়েই মাসির কাফন-দাফনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শান্তি কমিটির লোকজন আপত্তি তুলল। একজন হিন্দু মহিলার কাফন দাফন? দাদা কঠোরভাবে প্রতিবাদ করলেন,
-সে একজন মুসলিম! কালিমা পড়া মুসলিম! সে একজন প্রকৃত মুসলিম ছিল বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
গাড়োয়ান আর তার সঙ্গীকে সাথে নিয়ে, মাসির জানাযা পড়লেন। মাসির বাড়ির পেছনের বাগানে কবরের ব্যবস্থা করলেন। তারপর এসে সেই যে শয্যাশায়ী হলেন, দীর্ঘদিন আর উঠতে পারেননি। .
.
মাসির নির্মম আর করুণ মৃত্যুর দৃশ্য দাদাজীকে আজীবন তাড়িয়ে ফিরেছে। দাদাজির বিপদ দেখে মাসি আর স্থির থাকতে পারেননি। স্থানকালপাত্র ভুলে, বাঘিনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মাসি বলতে গেলে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনটা দাদাজির আশেপাশেই কাটিয়ে দিয়েছেন। মধ্যিখানে কয়েকবছর স্বামীর গৃহে বাস করে এসেছেন। দাদাজির পাশে থাকার জন্যে মাসি অনেক বড় বড় লোভকে ত্যাগ করেছেন। বিনিময়ে কখনো কিছুই চাননি। ঢাকায় বাস করতে পারতেন। পারতেন কলকাতায় থাকতে। তার যা সম্পত্তি ছিল, হেসেখেলে রানীর জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। সবকিছু পায়ে ঠেলে, সাধারণ একজন গ্রাম্য নারীর মতো, নিতান্ত আটপৌরে জীবন কাটিয়ে গেছেন। দাদাভাই বলতেন,
-বেলার কপালে ‘হেদায়াত’ লেখা ছিল। কালিমায়ে শাহাদাতই তাকে এখানে আটকে রেখেছিল।
দাদাজি আরও বলতেন,

-বেলাকে আল্লাহ তা'আলা ইজ্জতের মওত নসীব করেছেন। সে বটি হাতে বের না হলে, ঘরে এসে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হতো। ইজ্জত ঈমান দুইই হারাতে হত।
বেলামাসির একটা কাজে সবাই অবাক! তিনি কাউকে না জানিয়ে, তার সমস্ত সহায়-সম্পত্তির মালিকানা দাদাকে দিয়ে গিয়েছেন। একদম লিখিতভাবে। কোনও ফাঁক-ফোঁকর না রেখে। মাসি কেন একাজ করতে গেলেন? তার বুঝি দৃঢ়বিশ^াস ছিল, দাদাকে মালিক বানালেই তার দুই সন্তান নিশ্চিন্তে সম্পত্তির অধিকার পাবে। হলও তাই। দাদা পরবর্তীতে দুই ভাইবোনকেই সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। একটা কানাকড়িও এদিক সেদিক করেননি। মাসির শেষ মুহূর্তের উক্তিটা শোনার পর, দাদুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কথাটার অর্থ কী? দাদু বলেছিলেন,
-বেলা ছোটবেলা থেকেই তোর দাদাভাইকে পছন্দ করত। বয়েসের আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকা সত্ত্বেও। বিশেষ করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তোর দাদার চেষ্টাতেই বেলা ভালো ফলাফল করতে সমর্থ হয়েছিল। বেলা অনেক চেষ্টা করেছিল, তার বিয়ে ঠেকাতে। কিন্তু তোর দাদাই একপ্রকার জোর করে বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। বেলার মনের দুর্বলতা তোর দাদা বিয়ের আগে টের পায়নি। তার বাড়ির কেউও না। বেলাও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেনি। বুঝতে দেয়নি। স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা হয়ে এখানে ফিরে আসার পরও না।
.
দুই এতিম বাচ্চার লালন-পালনের ভার স্বাভাবিকভাবেই দাদা-দাদু নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। আগেও তারা দু'জনে আমাদের বাড়িতেই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতো, এবার থেকে স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, ওপার থেকে মাসির ভাই এল। দুই এতিম বাচ্চাকে নিয়ে যাবে। মাসির ছেলে যাওয়ার জন্যে নিমরাজি হলেও, প্রতিমা সম্পূর্ণ রূপে বেঁকে বসল। সে আম্মুকে আর দাদুকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। পরে দাদা, বোঝালেন, মেয়েটা যখন এত করে থাকতে চাইছে, জোর না করে,আরও কিছুদিন থাকতে দেয়াই ভালো। পরে বুঝিয়ে শুনিয়ে পাঠানো যাবে। মামা তার ভাগ্নেকে নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিমা রয়ে গেল। ঘরের মেয়ের চেয়েও বেশি আদর নিয়ে সে বেড়ে উঠতে থাকল।
.
.
যুদ্ধ শেষ হল। দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে রইল। স্থানীয় নেতাদের কাছে দাদা বেশ সমাদৃত হলেও, আব্বু হয়ে গেলেন ভিলেন। তিনি জান্নাতবাসী হয়েও কিছু মানুষের

কাছে আক্রোশের পাত্র হয়ে রইলেন। পাশাপাশি আমিও। এই ছোট আমির বিরুদ্ধেও রটানো হল, আমি বিহারী বিয়ে করেছি। আমিও নাকি আব্বুর মতো ভেতরে ভেতরে পাকিস্তানের সাপোর্টার।

.

স্টেশন থেকে এতদূর হেঁটে আসতে আসতে, স্মৃতির দীর্ঘ পথও পাড়ি দেয়া হয়ে গেল। এখন তাহাজ্জুদের সময়। দাদা কি এখনো মসজিদে আসতে পারেন? বেঁচে আছেন তো? দাদু? বাড়ি আর কতদূর? দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরলে, বাড়ির পথগুলো কি এত দীর্ঘ হয়ে যায়? নাকি দীর্ঘদিন দূরে থাকতে থাকতে মনের দূরত্ব বেড়ে যায়? প্রতিমা কি সেই দূরের মানুষ হয়ে গেছে? তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে! প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হবে!

দিনলিপি-১৪৮৪

(২০-১১-১৮)

দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (৪)!

-

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, দাদাজি আমাকে কিছুদিনের জন্য বাড়িতে এনে রাখলেন। ঢাকায় থাকা তখন নিরাপদ ছিল না। চারদিক থেকে বিহারীদের মৃত্যুর সংবাদ আসছিল। গ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। পাকসেনাদের হাতে বন্দী হয়েছেন, নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সে সুবাদে দাদাজিকে সবাই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল। অনেক হিন্দু তার আশ্রয় পেয়ে জীবন বাঁচানোর সুযোগ পেয়েছিল, তারাও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে ভুলত না। দাদাজি চাইলে অনেক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারতেন, তার কিছুই করেননি। তিনি আগের মতো তার ধর্মকর্ম আর শিক্ষাদীক্ষা নিয়েই মশগুল থাকলেন। এমনকি বেলামাসিকে নিয়েও দাদাজি কখনো মুখ খোলেননি। কষ্টের কথা বলেননি। পার্থক্য শুধু এটুকু, প্রতিমা আর ভাইকে আগের চেয়ে বেশি আদর দিতে লাগলেন। আপন সন্তানের চেয়েও বেশি মনোযোগ রাখলেন দুই এতীমের প্রতি।

.

ঢাকায় যে মাদরাসায় পড়তাম, তার আশেপাশের বাসার মুক্তিযোদ্ধারা কেন যেন আব্বুকে যুদ্ধবিরোধী মনে করত। অথচ আব্বু তার বিহারী বন্ধুকে বাঁচিয়েছেন। এছাড়া দেশের বিরুদ্ধে যায় তেমন কিছুই করেননি। বন্ধুকে বাঁচানো তাদের কাছে অপরাধ হয়ে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাদা তোলার সময় তিনি মোটা অংকের টাকা দিয়েছেন, সেটা তাদের চোখে পড়েনি। আসলাম চাচ্চুর সাথে যুদ্ধের আগে থেকেই পাকিস্তানীদের সাথে ভালো সম্পর্ক। কিন্তু চাচ্চুও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কিছু করেছেন, এমন প্রমাণ নেই। তিনি মনেপ্রাণেই বাংলাদেশে থাকতে চেয়েছিলেন। বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি, আশেপাশের মুক্তিযোদ্ধাদের কেউই আব্বুকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিছু করার ছিল না। তখন সময়টাই এমন, কাউকে পাকিস্তানের দালাল বা বিহারী বললেই, তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যেত। আব্বু ছিলেন সেই বৈরি সময়ের নির্মম শিকার।

.

ঢাকার পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল হয়ে এলে, দাদা আমাকে মাদরাসায় দিয়ে এলেন। ছুটিতে বাড়ি আসতাম। ছুটি শেষ হলে চলে যেতাম। ঢাকায় এলে আব্বুর কথা মনে পড়ত। মনে হত, তিনি বেঁচে আচেন। এই বুঝি তিনি এলেন। কিন্তু আর আসেন না। রুবাবার কথা আরও বেশি মনে পড়ত। সে এমনিতেই ছেলেবেলার খেলার সাথী। পরে বিবাহিতা স্ত্রী। এমন কাউকে ভুলে থাকা অসম্ভব। আম্মু, দাদা-দাদু ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। প্রতিমা যদি তখন বিয়ের উপযুক্ত হত, আম্মু বোধ হয়, তার সাথেই আমার বিয়ের আকদ করে রাখতেন। দাদু আর আম্মুকে এ বিষয়ে একদিন কথা বলতে শুনেছি।

.

মাদরাসার কাছেই ছিল রুবাবাদের বাসা। যুদ্ধের পর বেশ কিছুদিন বাসাটা এমনি এমনি খালি পড়েছিল। আমি প্রায়ই আসরের পর, বাসার চারপাশে ঘুরঘুর করতাম। অনেক সময় সত্যি সত্যি মনে হত, রুবাবা ওখানে আছে। গেট খুলে প্রবেশ করলেই হবে। মাঝে মাঝে এক কষ্ট হত, কিছুই করতে ইচ্ছা হত না। পড়ালেখায় মন বসত না। দাদু অনেক কষ্ট করে, এতদূর পথ বেয়ে আমাকে দেখতে আসতেন। দাদু আম্মু নিয়মিত চিঠি লিখতেন। মাদরাসার ছুটি হতে দেরী হলে, জোর করে বাড়িতে নিয়ে যেতেন। নানাভাবে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইতেন।

.

আম্মুর কথা ভেবে আজো আশ্চর্য হই। তিনি কিভাবে সহ্য করলেন? আব্বুর মতো মানুষ হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। আম্মুর দিনদিন শুকিয়ে যাওয়া দেখে বুঝতে পারতাম, কী ভেতরে ভেতরে কী কষ্টটাই না চেপে আছেন। আমি বাড়ি গেলে, তার প্রাণে যেন পানি আসত। কখনো বুঝতে দিতেন না, তার কষ্টের কথা। রুবাবার জন্য আমার কষ্টও তিনি বুঝতে পারতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে, নানা কথা বলে কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতেন। ঢাকায় আসার দিন, মায়ের করুণ চোখের দিকে তাকালে, একেকবার ঘর থেকে বের

হতে পা সরত না। মনে হত, কী হবে দুঃখিনী মাকে ছেড়ে লেখাপড়া করে? মায়ের সেবা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, বেশি ভাল হবে। আম্মু এমন কথা শুনে, করুণ হাসতেন। তবে টলতেন না। বুঝিয়ে সুজিয়ে দাদার সাথে পাঠিয়ে দিতেন।

.

আমি ছিলাম মায়ের একমাত্র সন্তান। আমি ঢাকা চলে এলে, প্রতিমা ছিল তার সব সময়ের সঙ্গী। মেয়েটা ছায়ার মতো লেগে থাকত আম্মুর সাথে। পুরোপুরি মুসলিমের মতোই তার জীবন কাটত। আম্মুরা তাকে ফাতিমা বলে ডাকতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকজন হিন্দু চেষ্টা করেছিল প্রতিমাকে তাদের কাছে নিয়ে রাখতে। তাদের কথা ছিল, একটা হিন্দু মেয়ে কিভাবে মুসলিম বাড়িতে থাকে? কিছু মুসলিমও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। পরে জানা গেছে, আসলে প্রতিমা নয়, তার বিপুল সম্পদই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। স্বার্থান্বেষী মহল এমন কথাও রটিয়েছিল, দাদা সম্পদের লোভেই হিন্দু মেয়েকে আটকে রেখেছেন। পরে যখন দেখা গেল, বেলামাসি স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি দাদার নামে লিখে দিয়ে গেছেন, তখন কিছুদিনের জন্য, কুচক্রিদল শান্ত হল। তারপর আবার কিভাবে যেন কথা উঠল, দাদা জোর করে, চাপের মুখে জমিজমা সব লিখিয়ে নিয়েছেন। তখন সবে পেপার পত্রিকায় অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। কিন্তু দাদাভাই যখন সবকিছু প্রতিমা ও তার ভাইয়ের নামে লিখে দেয়ার ঘোষণা দিলেন, তখন দুষ্টলোকেরা মুখে কুলুপ আঁটল।

.

প্রতিমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে, দাদাজান একের পর এক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি কখনো কখনো প্রশাসন পর্যন্ত গড়িয়েছে। ওপার বাংলা থেকেও ইন্ধন আসত। প্রতিমার সম্পদের প্রতি সবারই লোভ ছিল। তার মামা-কাকারাও পিছু ছাড়েনি। সব ঝামেলা দাদা বুক পেতে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিমাকে দাদাজান কী অসম্ভব মমতায় আগলে রেখেছিলেন, যারা কাছে ছিল, তারাই শুধু বলতে পারবে।

.

রুবাবাকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। দাদাজান নানা সূত্র ধরে পাকিস্তানে এমনকি বিহারে ও হায়দ্রাবাদেও খোঁজ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও খোঁজ বের করতে পারেননি। দাদাজান বারবার বলতেন, আসলামের কাছে তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানা আছে। লুবাবা বৌমাও আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়িয়ে গেছে। সেও ঠিকানা জানে। তারা একটু যোগাযোগ করবে না? নাকি কোনও সমস্যা হয়েছে? মানুষ মারা গেলে, মনকে সান্ত¡না দেয়া যায়, কিন্তু নিখোঁজ হয়ে গেলে, ধৈর্য ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে। আশা-

নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে মন বেচাইন হয়ে যায়। দাদু একবার আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, তারা বোধ হয় সম্পর্কটা রাখতে চায় না, তাই আর যোগাযোগ করছে না। নইলে বেঁচে থাকলে যোগাযোগ করবে না কেন?

.

ঢাকায় পড়ালেখা শেষ করার পর, দাদাজি চেয়েছিলেন আমি যেন বাড়তি পড়াশোনার জন্য ভারতে যাই। আমি দাদাকে বললাম,

-আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি আগে একটু পাকিস্তান থেকে ঘুরে আসতে চাই। তারপর না হয় ভারতে যাব।

-কেন, রুবাবাদের খোঁজে?

-জি¦।

-এতবড় দেশে তাদের কোথায় খুঁজবে? ভারত থেকে শুরু করলে ভালে হত। হায়দ্রাবাদে গিয়ে দেখতে একটু।

-হায়দ্রাবাদ কতবড় শহর! কোথায় খুঁজব। পাকিস্তানের মতো হায়দ্রবাদেও ঠিকানাবিহীন।

-আচ্ছা, তোমার মন যেহেতু টানছে, তাহলে আগে পাকিস্তানেই যাও। আমার মনে হয়, সেখানে কোনও মাদরাসায় উচ্চতর কোনও জামাতে ভর্তি হয়ে, ফাঁকে ফাঁকে খোঁজ করলে ভাল হবে। দুই দিকই হবে। সময়টাও নষ্ট কম হবে।

.

সুবহে সাদিক হতে এখনো কিছু সময় বাকি আছে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। মিটমিট করছে। আমার মতোই নিঃসঙ্গ। দাদাজি ছেলেবেলায় তারা চেনাতেন। ভোররাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে, মন ভালো থাকলে কোন তারার কী নাম, একটা একটা করে চিনিয়ে দিতেন। পরে পরীক্ষাও নিতেন। দাদার কাছ থেকে শেখা তারকাজ্ঞান কত যে উপকারে লেগেছে! সেবার আমরা তোরাবোরা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আঁধার রাতে তারা দেখে আমি দিক ঠিক রেখে, মুজাহিদ দলকে রাশান বাহিনীর ক্যাম্পের একদম কাছাকাছি নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। গাড়ির পথ ছিল না, মোটর সাইকেল নেয়াও সম্ভব ছিল না। আল্লাহর রহমতে সেদিনের এমবুশে, ক্যাম্প থেকে একটা রাশান কুকুরও বের হতে পারেনি। অভিযানের পর, আমার কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব চেপেছিল, মুজাহিদ কমান্ডারদের তারকা চেনানোর দায়িত্ব। অত্যন্ত আনন্দের সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। দাদাজানের প্রতিটি শিক্ষাই ময়দানে পদে পদে কাজে লেগেছে।

.

কতদিন পর গ্রামের মাটিতে পা দিলাম। সামনের মোড়টা ফিরলেই এবাদ চাচার বাড়ি। তারপর পুস্কুরিনি। তারপর পাতাখোলা পেরিয়ে গেলেই আমাদের কাছারিবাড়ি আর মসজিদ। ইচ্ছে হল কিশোরবেলার মতো ছুটে যাই। চপল পায়ে মসজিদের দরজায় গিয়ে উঁকি মারি! দাদাজানকে জড়িয়ে ধরি। দাদাজান কি আজ এসেছেন? ঐ তো মসজিদের দরজায় হারিকেন জ¦লছে! ইয়া আল্লাহ! আমার দাদাজান তাহলে বেঁচে আছেন? দাদাজি!

.

নিরবে মসজিদের সদর দরজা পেরোলাম। হ্যাঁ, দাদাজির কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। মুনাজাতে কাঁদছেন। কতদিন এই আওয়াজ শুনিনি। কান্দাহারে, হেরাতে, কাবুলে কত কত অভিযানে শরীক হওয়ার তাওফীক হয়েছে। কত দেশের কত বুযুর্গ মুজাহিদের সাথে ময়দানের মেহনতে যোগ দেয়ার তাওফীক হয়েছে! কত বড় বড় আলিমের দেখা পেয়েছি! আরবের কত বড় বড় শায়খকে দেখেছি! সবাই অত্যন্ত পরহেযগার! কিন্তু দাদার মতো মুনাজাত ধরে শিশুর মতো কাঁদতে পারে, এমন কাউকে পাইনি। আমরা যখন বড় কোনও অভিযানে বের হতাম, অভিযানের আমীর তুলনামূলক বেশি মুত্তাকি হতেন, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার আগে, মুনাজাতে সবাই এমনভাবে কাঁদত, একটি শিশু যেন কয়েকদিন যাবত মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত! আমার দাদাজান নিশিরাতের তাহাহজ্জুদ পরবর্তী মুনাজাতে তার চেয়েও বেশি অস্থির হয়ে কাঁদতেন।

.

আজও হুবহু সেভাবেই কাঁদছেন! আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কাঁদতে পারা, বান্দার জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যগুলোর একটি। আল্লাহ তা‘আলার খাস রহমত, দাদার সান্নিধ্যে থেকে ছোটবেলা থেকেই এই সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক হয়েছে। এখন মসজিদে প্রবেশ করলে, দাদাজি টের পেয়ে যাবেন। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদাজির হৃদয়নিঙড়ানো কান্না শুনছি। আমার চোখ দিয়েও কেন যেন দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগলে। বাধা দিলাম না। গভীর রাতে আল্লাহর দরবারে কাঁদার মধ্যে কী যে সুখ, তা ক’জন জানে? জান্নাতী সুখ কেমন হবে তা জানি না, বলতে ইচ্ছে করে, শেষরাতে আল্লাহর কাছে দু’হাত তুলে ভিখির হয়ে কাঁদার সুখের সাথে একমাত্র জান্নাতী সুখেরই তুলনা চলে।

.

স্থানকাল পাত্র ভুলে গেলাম। আমি যেন জান্নাতে চলে গেছি। দাদাজি গুঁজরে গুঁজরে কাঁদছেন। আল্লাহু আকবার! আমার কথাও বলছেন। আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাত নসীব করেন। আর জীবিত থাকলে তার কোলে ফিরিয়ে আনেন। সন্তানকে হারিয়েছেন।

একমাত্র নাতি বেঁচে আছে কি না, জানেন না, নাতির যাতে ভালো হয়, সে দু‘আ করছেন। বৃদ্ধবয়েসে শেষক’টা দিন তার ইবাদত বন্দেগী করে কাটিয়ে দেয়ার তাওফীক কামনা করছেন। মুনাজাত শেষ হতে আরও সময় লাগবে। দাদাজির মুনাজাত শুনে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। হু হু করে কান্না আসতে চাইল। আমার দাদা শুধু আমার দাদাই নন, বাবার আদরও তার কাছে পেয়েছি। জীবনের যাবতীয় শিক্ষার অধিকাংশই তার কাছে পেয়েছি।

.

দাদাজির ভোরাতের মুনাজাত কখনো আধাঘণ্টার আগে শেষ হয় না। যেদিন মন বেশি আল্লাহর দিকে রুজু থাকে, সেদিন আরও লম্বা হয়। সাধারণত ফজরের আযান হলে, দাদাজি মুনাজাত বন্ধ করেন। আযানের জবাব দেন। তারপর সুন্নত পড়ে বেরিয়ে পড়েন। জোরে যিকির করতে করতে এ-পাড়া ওপাড়া হেঁেট মুসল্লিদের জাগিয়ে তোলেন। একান্ত আপনজনদের সাথে করে নিয়ে আসেন। মা-বোনদেরও জাগিয়ে দেন। প্রায় সব বাড়ির বৌ-ঝিদের নাম জানেন। ছেলে বা মেয়ের নাম ধরে ডাকেন! ও আমেনার মা, ওঠো ওঠো! ও রহিমার দাদী, উঠে পড়ো। মহিলাদের ডাকলে, জবাবের অপেক্ষা করেন না। পুরুষদের জবাব না শোনা পর্যন্ত ডেকে যেতে থাকেন। এমনো হয়েছে, আমেনার মাকে ডাকছেন। অথচ আমেনার কত আগে বিয়ে হয়ে গেছে। সে শ^শুরবাড়িতে নিজেও কারো ‘মা’ বনে গেছেন। মাঝেমধ্যে এমনও হতো, আমেনারা বাপের বাড়িতে নাইওর এসেছে, দাদার ডাক শুনে ধড়মর করে উঠে এসেছে। চোখের পানি মুছতে মুছতে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। আবেগে দাদাজির হাত ধরে, এই রাতেই ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি শুরু করেছে,

-দাদা স্মিত হেসে বলেন, আরে করিস করিস কি! থাম পাগলি, থাম! জামাত দাঁড়িয়ে যাবে! এখন বসার সময় নেই। ইশরাক পড়ে একপাক ঘুরে যাব। তোর ছেলে কেমন হয়েছে? রফিক নাম রেখেছিলি না?

-দাদাজি, আপনি আমার ছেলের নামও জানেন?

-জানব না? তোদের সকলের খবরাখবরই আমি নিয়মিত রাখি।

-দাদাজি, আপনার এই ডাকের কারণেই আমরা যারা আপনার ছাত্রী ছিলাম, সবাই শ^শুরবাড়িতে গিয়েও নামাজি আছি। প্রতি ভোরে কানপেতে থাকি, আপনার ডাক শুনতে পাব বলে। কিন্তু তা যে হওয়ার নয়। বাবার বাড়িতে এলে, আপনার ডাক শোনার জন্য চাতকের মতো অধীর হয়ে থাকি। আমরা ছাত্রীরা সবসময় আপনার কথা ভাবি। আপনার কথা বলি।

-রাখ পাগলি! এখন যাই, পরে তোর কথা শুনব!
.
দাদাজি মুনাজাত শেষ করতে করতে আমি ওজু করে আসি। সফর থেকে ফিরলে মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। পাশাপাশি তাহাজ্জুদের সময়ও আছে। একসাথে দুই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। ওজু করে আসার পরও দেখি দাদাজির মুনাজাত তখনো শেষ হয়নি। মসজিদের বাইরে বারান্দায় নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাজে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলাম, দাদাজি আমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছেন। সালাম ফেরাতেই দাদাজি প্রায় ছুটে এলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়েই দাদাজিকে জড়িয়ে ধরলাম। কত কথা জমে আছে। কত প্রশ্ন জমাট বেঁধে আছে। সেসব চাপিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইলাম,
-আমি তো কোনও আওয়াজ করিনি, আপনি মসজিদের ভেতর থেকে কিভাবে টের পেলেন?
-কেন তোমার গায়ের গন্ধে? তুমি যখন মোড় পার হয়েছ, তখনই আমার মনে হয়েছে তুমি আসছ। একটু পরেই নতুন একটা ঘ্রাণ নাকে লাগল। নিশ্চিত হতে না পারলেও, বুঝতে পারলাম, নতুন কেউ মসজিদের আশেপাশে এসেছে। এখন ভোর! বাতাস অনেক পাতলা। অপরিচিত কোনও গন্ধ হলে, নাকে লাগে। দেখছ না হালকা বাতাসও বইছে।
-দাদাজি, আপনি সেই আগের মতোই চনমনে আছেন। আপনার সব ইন্দ্রিয়ই আগের মতো তীক্ষ্ম আছে। দাদাজি আপনার কথা শুনে ইয়া‘কূব আ.-এর কথা মনে পড়ে গেল।
-কুরআনের আয়াতটার কথা বলছ?
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ
যখন এ যাত্রীদল (মিসর থেকে কিনআনের দিকে) রওয়ানা হল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (আশেপাশের লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি (ইউসুফ ৯৪)।
.
আমাকে পেয়ে এই বয়েসেও দাদাজি প্রায় অস্থির হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একবার বসেন, আরেকবার দাঁড়ান। আমার হাত ধরে মসজিদের পুকুর পাড়ে এলেন। মসজিদে বসে ব্যক্তিগত আলাপ করবেন না, তাই। আযানের এখনো দেরী আছে। দু’জনের মনেই হাজারো প্রশ্ন। কার আগে কে করবে?
-দাদুর কী অবস্থা?
-তিনি আছেন। ভালো আছেন। তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে জীবন শেষ করে ফেলেছেন। কত দিন ধরে তোমার চিঠি পাইনা। যতদিন চিঠি আসত, আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলতাম। তুমি বেঁচে আছো, এটুকুই আমাদের জন্য অনেক বড় সান্ত¡না। চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, আমরা ধরে নিয়েছিলাম, তুমি শহীদ হয়ে গেছ। আচ্ছা, বাড়ির দিকে চল।
-আম্মু?
-জি¦। চলো গেলেই দেখতে পাবে।
-দাদাজি, আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি আপনার হাত ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছি। একটু পর দাদু আর আম্মুর সাথে দেখা হবে। এমন মুহূর্ত কল্পনা করে অসংখ্য রাত ভোর হয়েছে।
-তোমাকে আসল প্রশ্নই করা হয়নি, রুবাবার কথা কিছু বলোনি!
-কী আর বলব দাদাজি! কষ্টের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল। একটু ধাতস্থ হয়েনি। আস্তে আস্তে সব বলব। ইনশা আল্লাহ।

দিনলিপি-১৪৮৫
(২১-১১-১৮)
দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (৫)!
-
দাদার হাত ধরে হাঁটছি। বাড়ির পথে। সেই ছেলেবেলার মতো। মনে চাচ্ছে উড়ে যাই। দাদিজান আছেন। আম্মিজান আছেন। আর.. আর..! প্রতিমা কি আছে? দাদাজিকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে। প্রতিমা কেন অপেক্ষা করবে? কিসের আশায়? কার আশায়? দাদাজি গুনগুন করে যিকির করছেন।
ভোররাতের নিরব মুহূর্তগুলো আমি আর দাদাজি খুব উপভোগ করি। একদম ছোটবেলাতে, আমি ঘুমুতাম দাদা-দাদুর কাছে। একটু বড় হওয়ার পরও মাঝেমধ্যে। দাদাজি চাইতেন আমাকে লুকিয়ে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে, আমি কিভাবে যেন জেগে যেতাম। প্রতিদিন হয়তো সজাগ হতে পারতাম না। ফজরের সময় ডাকলে, অভিমান হত, কেন আমাকে তাহাজ্জুদের সময় ডাকা হল না। আসলে সারাদিনে নানা ব্যস্ততায় দাদাজিকে একান্ত নিজের করে পাওয়া কঠিন ছিল। তাহাজ্জুদের সময় নিজের করে পাওয়া যেত। দাদাজি কত কথা বলতেন। মসজিদে যেতে যেতে। তাহাজ্জুদের ফাঁকে ফাঁকে। আমি থাকলে, মুনাজাতে বেশিরভাগ কথা বলতেন আমাকে নিয়ে। কত কত দু‘আ করতেন আমার জন্য। আমি বুঝে না বুঝে আমীন আমীন বলে যেতাম।

.
দাদাজির সাথে তাহাজ্জুদে গেলে, দাদাজি একটি কাজ করতেন। তিনি আমাকে নামাজে দাঁড় করিয়ে দিতেন। বলতেন উচ্চ আওয়াজে, স্পষ্প উচ্চারণে তিলাওয়াত করতেন। এতে নাকি যবান খোলে। মুখের জড়তা থাকলে কেটে যায়, কুরআন থেকে দলীলও দিতেন,
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا
অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমন যা, কঠিনভাবে প্রবৃত্তি দলন করে এবং যা কথা বলার পক্ষে উত্তম (মুযযাম্মিল ৬)।
এটা ছিল দাদাজির একান্ত নিজস্ব ফর্মূলা। আমরা হেরাতে থাকাকালে, আমাদের সাথে একদল উজবেক মুজাহিদ ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল মুস্তাফা। বেচারা শরীরে প্রচণ্ড শক্তি ধরতেন। দু'হাতে দু'টি মেশিনগান নিয়ে একসাথে চালাতে পারতেন। পুরো ম্যাগজিন একটানে একসাথে শেষ করতে পারতেন। খুব কম সাথীকে দেখেছি এভাবে একসাথে দু'টি মেশিনগান চালানোর শক্তি ধরতে। শুনেছি শায়খ খাত্তাবও পারেন। যাক, মুস্তাফার একটাই দুঃখ, সে কথা বলতে পারেন না। একসাথে দুই শব্দের বেশি বলতে গেলে মুখে আটকে যায়। হেরাত রাশান ভল্লুকমুক্ত হওয়ার পর, আমরা কিছুদিন অবসর পেয়েছিলাম। তখন মুস্তাফাকে নিয়ে পড়লাম। তার উপর দাদাজির ফর্মূলা প্রয়োগ করলাম। মুস্তাফা হাফেজ ছিলেন না। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, অল্পদিনের মধ্যে তার মুখের জড়তা কাটিয়ে দেব। সে বিশ^াস করতে পারেনি। সারাদিন তাকে নিয়ে থাকলাম। প্রথমে সূরা মুযযাম্মিল মুখস্থ করতে দিলাম। রাত তিনটার পর, আমীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে, বাংকার ছেড়ে মুস্তফাকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে চলে গেলাম। উপরে খোলা আকাশ। মিটিমিটি তারা জ¦লছে। চারদিকে অপূর্ব নিস্তব্ধতা। মুস্তাফাকে গলা ছেড়ে নামাযে তিলাওয়াত করতে দিলাম। এভাবে একটানা কয়েকদিন করলাম। সবাই অবাক হয়ে দেখল, মুস্তাফার জড়তা সত্যি সত্যি কমে আসছে। এক চেচেন ভাইয়ের উপরও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলাম। কাজ হাতেনাতে। মুস্তাফাকে দুষ্টুমি করে সাথীরা বলত,
-মুস্তাফা! তুমি তো শহীদ হয়ে যাবে, জড়তা ঠিক করে কী হবে?
মুস্তাফাও কম যায় না,
-কেন, কথা বলতে না পারলে, সত্তরটা হুরের সাথে প্রেম কিভাবে করব?
-তা প্রেমিকমশায়ের কি জানা আছে, জান্নাতে গেলে দুনিয়ার কোনও দুর্বলতাই বাকি থাকবে না!

.

.

মাকে ছেড়ে, প্রতিমা কোনও দিন দাদুর সাথে কোনও দিন আম্মুর সাথে থাকতো। বাড়ির পরিবেশের ছোঁয়ায় প্রতিমার ঘুমও ভেঙে যেত। বেলামাসি মেয়ের এই কাজে খুশি হতেন কি না, জানি না। তবে কোনওদিন বাধা দিতে দেখিনি।

.

.

রুবাবা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে, সেও কিভাবে যেন দাদাজির ন্যাওটা হয়ে উঠল। দাদাজির মধ্যে এই একটা ব্যাপার আছে, ছোটবড় যারাই একবার তার সংস্পর্শে এসেছে, তারাই তার সম্মোহনী ব্যক্তিত্বে চুম্বকের মতো আকর্ষিত হয়েছে। আমি দাদাজির হাত ধরে মসজিদে যাই, রুবাবা বায়না ধরল, সেও মসজিদে যাবে। রুবাবার দেখাদেখি প্রতিমাও। দাদা পড়লেন উভয়সংকটে। রুবাবা যা রাগী আর অভিমানী, তাকে না নিয়ে গেলে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলবে। দাদাজি চাইতেন না, রুবাবা ঘরের বাইরে যাক। তাকে লোকজনর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চাইতেন। প্রতিমাকে মসজিদে নিয়ে গেলে, গ্রামের মানুষই আপত্তি করবে। দাদার ঘরে হিন্দু ছেলেমেয়ে থাকে, এটা নিয়েই নানা কানাঘুষা। দাদার ব্যক্তিত্বের কারণে কেউ টুঁ-শব্দটি করার সাহস পায় না, আবার কোনও অন্যায়ও বের করতে পারে না, তাই চুপ থাকে। নানাদিক বিবেচনায় প্রতিমার মসজিদে যাওয়া হত না। রুবাবাকে মানুষের নজর থেকে হেফাযত করার জন্য মসজিদে নিতে চাইতেন না। বদনজর বড়ই ভয়ংকর বিষয়। বদনজরে অনেক শিশুর জীবনই ধ্বংস হয়ে যায়। দাদাজি এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতেন।

.

রুবাবা যখন বুঝতে পারল, তাকে মসজিদে নেয়া হবে না, তার নাকের দুই পাটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। রাগে দুই গন্ড টকটকে লাল হয়ে উঠল। দাদাজি বুঝতে পারলেন। তখন আশ্বাস দিলেন দিনে নিয়ে যাবেন না। রাতের তাহাজ্জুদে নিয়ে যাবেন। তারপরে মেয়ে শান্ত হল। রুবাবার মধ্যে এমন এক আভিজাত্যমাখা সৌন্দর্য ছিল যে, সেই ছোট্টটি থাকতেই, তাকে কেউ একবার দেখে চোখ ফেরাতে পারত না। তার চলাফেরাতেও ভিন্ন এক ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। অন্য আর দশটা মেয়ে যেসব কাজ করে, যেসব খেলা খেলতে খুবই আগ্রহী, রুবাবা সেসবে আগ্রহী হত না। তবে কারো সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলে, খুবই আপন হয়ে মিশতে পারত। সেই ছোট্ট বয়েস থেকেই দেখেছি তার মধ্যে হালকা কিছু ছিল না। এটা সে পেয়েছে চাচী থেকে। রুবাবার মধ্যে একধরনের খান্দানি নবাবিয়ানা

ছিল। তার কাছে গেলেই আলাদা করে চোখে পড়ত। রুবাবা সহজে কারো সঙ্গে মিশতে পারত না। তার রুচিবোধ, তার আভিজাত্য, তার পরিচ্ছন্ন মানসিকতা তাকে হুট করে মিশে যেতে বাধা দিত। তাই বলে, কারো প্রতি তার অবজ্ঞা, অবহেলা, উপেক্ষা ছিল এমন নয়। অন্যের প্রতি তার মনে গভীর মমতা সে লালন করত। চট করে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিল না, এই যা।

.

ঢাকায়, চাচীর সাথে অনেক খান্দানী বিহারী ও পাকিস্তানী পরিবারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। বাঙালি আর পাকিস্তানী খান্দানি পরিবারগুলোর মধ্যে একটা পার্থক্য চোখে পড়েছে, আভিজাত্যের বিচারে, বাঙালির চেয়ে উর্দুভাষী পরিবারগুলো এগিয়ে থাকত। তবে উর্দুভাষী খান্দানী পরিবারের সবগুলোর মধ্যে না হলেও, বেশিরভাগের মধ্যে, কেমন যেন বাঙালিদের প্রতি একধরনের অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা কাজ করত। চাপা এক অহংকার তাদের চলনবলনে ধরা পড়ত। শাসক আর শাসিতের পর্যায়ের না হলেও, প্রায় কাছাকাছি কিছু হবে। ব্যতিক্রমী পরিবার যে চোখে পড়েনি, তা নয়। অসাধারণ কিছু পরিবারের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগও হয়েছে। লুবাবাচাচীর সাথে যেখানেই গিয়েছি, রুবাবার মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ করেছি। সে কিভাবে যেন, পবিবারের সবচেয়ে জ্ঞানী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হত। চাচীর হাত ধরে, অনেক বড় বড় সেনা অফিসার, ডাকসাইটে ধনকুবের, হাইপ্রোফাইল সরকারী কর্মকর্তার বাড়িতে গিয়েছি। চাচীর জ্ঞান, চাচীর ব্যক্তিত্ব, চাচীর আভিজাত্য সবাইকে আকর্ষণ করত। সেজন্য দাওয়াতও পেতেন। সবাইকে আপন করে নেয়ার অপূর্ব এক যোগ্যতা ছিল চাচীর মধ্যে।

.

একবার চাচী নিয়ে গেলেন, উর্দু মুশায়ারায়। এক পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর বাড়িতে। উর্দু ঘরানায় একটা ব্যাপার দেখেছি, তারা ভালোভাবে পর্দা মানে। মুশায়ারায় পুরুষ ও নারী কবিদের আলাদা ব্যবস্থা। পুরুষরা এক হলঘরে, নারীরা আরেক হলঘরে। আমরা যারা ছোট, তাদের সুবিধা হল, নারী ও পুরুষ উভয় মুশায়ারায় অবাধে যাতায়াত করতে পারে। এ-ধরনের অভিজাত আয়োজনে গিয়ে আমি কিছুটা কুঁকড়ে যেতাম। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতাম। রুবাবাকে দেখতাম দিব্যি মিশে যেতে। সেই মুশায়ারাতেই ব্যাপরটা প্রথম চোখে পড়ল, যেনানা (মহিলা) মুশায়ারায় যিনি ফয়সাল (বিচারক) রুবাবা তার কাছে গিয়ে বসেছে। ফয়সাল বৃদ্ধাকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। তিনি এক বড় জেনারেলের মা। দেশভাগের পর দিল্লি থেকে লাহোরে গিয়ে থিতু হয়েছেন। অল্প সময়ের

মধ্যেই রুবাবার সাথে বৃদ্ধার সখ্য হয়ে গেল। দু’জনে নিচু আওয়াজে মিটিমিটি হেসে কথাও বলতে লাগল। তখন ভেবে কুল পেতাম না, রুবাবা কিভাবে এত বড় বড় মানুষের অন্তরে স্থান করে নিত?

.

পুরুষদের মুশায়ারায়ও একই কাহিনী। রুবাবা বড় বড় কর্তাদের কাছে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে যাচ্ছে। পুরুষদের মুশায়ারায় অবশ্য আসলাম চাচ্চুও থাকতেন। তাই রুবাবা নির্ভয়ে যেতে পারত। এত ভীড়ের মধ্যে, আমি এককোনে কুঁকড়ে থাকতাম। সবার মুখে উর্দুর খই ফুটছে, আমি উর্দু বুঝতে পারলেও সেভাবে বলতে পারতাম না। তাই ওই পরিবেশে কিছুটা হীনমন্যতায় ভুগতাম। রুবাবা কিভাবে যেন টের পেত আমি একা হয়ে গেছি। প্রজাপতির মতো ছুটে আসত। হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত সমবয়েসীদের কাছে। সে শুধু প্রবীণদের সাথেই নয়, ছোটদের সাথেও সময় কাটাত। একদল মানুষের মধ্যে যেমন সবচেয়ে ভালোটাকে রুবাবা চট করে চিনে ফেলত, ছোটদের দলে এলেও, সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিমতীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনে ফেলত। চাচীর সঙ্গ পেয়ে রুবাবার সেই বয়েসেই অনেক শে‘র-কসীদা মুখস্থ ছিল। অনেক সময় এমনও হয়েছে, শের কাটাকাটিতে একপক্ষ চুপ হয়ে গেলে, রুবাবা নিজের মনে বিড়বিড় করে সমাধানসূচক পংক্তি আওড়ে ফেলত।

.

বযমে মুশাআরা বা কবিতা উৎসবের প্রচলন বাঙালি পরিবারেও ছিল, কিন্তু ঢাকার পরিবারগুলোতে এমন কিছু হতো কি না, জানতে পারিনি। হলেও উর্দুর মতো এভাবে জাঁকজমকপূর্ণ ঘরোয়াভাবে হতো না বোধ হয়। বেশ কয়েকটা মুশা‘আরায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। চাচীর কবিতাপ্রীতির কারণেই এটা হয়েছে। দেখেছি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখেও ইকবাল, গালিব, মীর, জিগর, বেদিল, হালি, ফিরাখ আরও অসংখ্য শায়েরের শে‘র অনর্গল বের হচ্ছে। আমাদের বাঙালি পরিবারে এমন কবিতাপ্রীতি দেখিনি। এমন খানদানি ইন্তেজামও দেখিনি।

.

মুশা‘আরায় গেলে, রুবাবা একদ- স্থির থাকত না। সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরপাক খেতে থাকত। একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে। যেন একটি মৌমাছি! ঘুরে ঘুরে নানা ফুল থেকে মধু আহরণ করে বেড়াচ্ছে। মধু আহরণের ফাঁকে ফাঁকে মায়ের কোলে গিয়ে বসছে, একদৌড়ে বাবার কাছে গিয়ে কানে কানে কিছু বলে আসছে। আবার আমার হাত ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আনছে। তার পরিচিতজনদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে

দিচ্ছে, তার ‘ওস্তাদজি’ বলে। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় তার মুখে একটা দুষ্টুহাসি লেপ্টে থাকত। প্রতিটি মুশা‘আরা থেকে আমি শূন্য হাতে ফিরলেও, রুবাবাকে দেখতাম অসংখ্য নতুন শে‘র শিখে এসেছে। একবার শুনে কিভাবে একটার পর একটা শে‘র ধরে ফেলত, অবাক লাগত। চাচীও তাই। মুশা‘আরা থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। এতরাতে চাচী আমাকে আর মাদরাসায় যেতে দিতেন না। ঘরে রেখে দিতেন। তারপর শুরু হত, মা মেয়ের নিজস্ব মুশা‘আরা। আমি অসহায়ের মতো বসে থাকতাম। কিন্তু ভালো লাগত মা-মেয়ের কবিতাপ্রীতি দেখে। তাদের কবিতাচর্চা শুনে, অভিভূতের মতো শুনতে থাকতাম। মা জানতে চাইতেন, -রুবাবা, তোমার ওই শে‘রটা মনে আছে?
-কোনটা?
-ওই যে, জলন্ধরের মহিলাটি ইরশাদ করেছিলেন,
-ও, সেটা। বলছি শুনুন। আম্মি, ওই শে‘রটার প্রথম লাইনটা কি? দিল্লিওয়ালী দাদীজান যেটা ইনশাদ করেছিলেন?
-বলছি শোন!
এভাবে মা আর মেয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতেন। দুজনের মধ্যে অদৃশ্য একটা বোঝাপড়া থাকত। ভাবটা এমন, আমি যে শে‘রগুলো তুলে রাখতে পারব না, তুমি সেগুলো মনে করে তুল রেখ। ঘরে এসে অদলবদল করে নেব।

.

এরপরের ক’দিন আমি রুবাবাকে পড়াব কি, সেই আমাকে শে‘র পড়াত। ওস্তাদজি, একটি গযল শুনবেন?
-কুরআন পড়া বাদ দিয়ে গযল?
-যরা সুনিয়ে না! স্রেফ এক মিসরা‘। একটু হলেও শুনুন না। ¯্রফে একটি লাইন!
এত ছোট্ট বয়েসে কি রুবাবা শে‘রগুলো বুঝতে পারত? নইলে বেছে বেছে বিশেষ বিশেষ শে‘রগুলো কেন আমাকে শোনাত? তার মুখে শে‘রগুলো শুনে আমার কান গরম হয়ে উঠত। কিন্তু রুবাবা নির্বিকারচিত্তে শে‘রগুলো পড়ে যেত। শুধু পড়েই ক্ষান্ত হত না। আমাকেও বলিয়ে ছাড়ত। একেকটি মুশা‘আরা রুবাবাকে আগের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ করে দিত। অনেক শিক্ষিত করে তুলত। অনেক অভিজ্ঞ করে দিত। বয়েসের তুলনায় সে অনেক এগিয়ে যেত।

.

আফগানে বিভিন্ন অভিযানে নতুন নতুন দল গঠন করা হত। প্রতিটি কাফেলায় কয়েকজন পাকিস্তানী ভাই থাকতেনই। সুযোগ পেলেই আমরা মু‘শাআরার মজলিস

কায়েম করে ফেলতাম। এমনও হয়েছে, রাশান জেট ফাইটার বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করছে, আমরা বাংকারে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছি, আর ফাঁকে ফাঁকে শে‘র কাটাকাটি করছি। আসলে ভয় কাটাতেই আমরা নানা কৌশলের আশ্রয় নিতাম। পাকিস্তানী সাথীরা অবাক হয়ে যেত, তাদের বাঙালি ‘ভন্দু’ এত উর্দু শে‘র কিভাবে পারে? তারা কিভাবে জানবে, আমি আমার হারানো ‘জানেমানের’ কাছেই উর্দু শে‘র-শায়েরীর দীক্ষা নিয়েছিলাম!

.

দাদাজির একটা শিক্ষাকৌশল হল, ছোটদের ধরে এনে বড়দের সান্নিধ্যে রাখা। মুসলমান ছাত্র তো বটেই হিন্দু ছাত্রদেরও, তাদের মুরুব্বীদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করতেন। পদ্ধতিটা ছিল ব্যবহারিক। আমাদের গ্রামে বিভিন্ন পেশার লোকজন বাস করতেন। কামার-কুমার, তাঁতী-জেলে, কৃষক-ছুতার। প্রতি সপ্তাহে বা পনের দিন পরপর, দাদাজি একেক পেশার অভিজ্ঞ লোককে আগে থেকে বলে রাখতেন। ছাত্রদের পাঠানোর আগে, বারবার নির্দিষ্ট পেশাজীবীর সাথে কথা বলতেন। ছাত্রদের কি কি শেখাতে হবে, কি কি বলতে হবে, সব গুছিয়ে দিয়ে আসতেন। তারপর আমরা যেতাম। সারাদিন থাকতাম। ফজরে পড়ে চলে যেতাম। যাদের কাছে যেতাম, তারা ছিলেন একেকজন লোকশিক্ষক। যুগযুগান্তর ধরে একজন আরেকজন থেকে নিজেদের পেশা শিখে আসছেন। চর্চা করে আসছেন। তার প্রত্যেকেই হাজার বছরের অভিজ্ঞতা প্রজন্ম প্রজন্মে বহন করে চলছেন। তিনি হাতের কাজ করতেন, আমরা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে হাতের কাজ দেখতাম। এটাওটা এগিয়ে দিতাম। টুকটাক কাজ করে দিতাম। ফাঁকে ফাঁকে তিনি জীবনের গল্প করতেন। আসার আগে দাদাজি আমাদের শিখিয়ে দিতেন কোন কোন প্রশ্ন করতে হবে। এদিকে লোকশিক্ষককেও শিখিয়ে-পড়িয়ে গেছেন। বানিয়ে কিছু বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করতেন। যা নিজের জীবনে ঘটেছে, যা সত্য তাই ছাত্রদের কাছে নিজের সাধ্যানুযায়ী গুছিয়ে বলতে অনুরোধ করতেন। এমনি এমনি নয়, দাদাজি হিশেব করে, একদিনের মুজুরির চেয়েও অনেক বেশি টাকা তাকে দিয়ে দিতেন। হিশেবের খাতায় এই টাকা তুলতেন, ‘অধ্যাপনা ফি’ শিরোণামের পৃষ্ঠায়। দাদাজি একেকজন পেশাজীবীকে জীবন্ত অধ্যাপক হিশেবে বিবেচনা করতেন। সম্মানও করতেন। যাদের কাছে ছাত্র পাঠাতেন, তাদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আলাদা করে গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দিতেন। ‘জীবন ইশকুল’ শিরোনামে তাদের নামও শিক্ষকের তালিকায় উঠিয়ে রাখতেন। এসব পেশার অনেকেই হিন্দু হতেন। দাদাজি বছর-ছমাসে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে জড়ো করতেন। এদিনও তাদের প্রত্যেককে সারাদিনের মজুরি দিয়ে দিতেন। জীবন ইশকুলের শিক্ষকগণ

কিছু সময় দাদার সাথে সময় কাটাতেন। দাদাজি তাদেরকে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতেন। কখনো নবীজি সা.-এর কথাও শোনাতেন। ইসলামের কথা সরাসরি কিছু বলতেন না।

.

পেশাজীবি মানুষের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি জীবনেসায়াহ্নে দাঁড়ানো অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছেও পাঠাতেন। আমরা নির্দিষ্ট দিনে কোনও এক বাড়িতে গিয়ে, বৃদ্ধ লোকটির সাথে কিছুটা সময় কাটাতাম। তিনি গল্প করতেন। আমরা প্রশ্ন করতাম। জীবনে কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কি কি করেছেন, সব খুলে বলতেন। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসতেন। আমরা দু'হাত ভরে তার জীবনগল্প কুড়িয়ে নিতাম। শুধু ছেলেদের জন্যই নয়, মেয়েদের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিতেন। গ্রামের অভিজ্ঞ মহিলাদের কাছে আদরের ছাত্রীদের পাঠাতেন দাদাজি। জীবন ইশকুলের রেজিস্টারে মহিলা অধ্যাপিকাদের তালিকাতে অভিজ্ঞ মহিলাদের নামের তালিকাও থাকত। তাদেরকেও সম্মানজনক ভাতা দিতেন। কাকে কখন কত দেয়া হল, সেটা লেখা থাকত।

.

দাদার 'জীবন ইশকুলে' আমরা হেন পেশা নেই, যা শিখিনি। ঠেলাগাড়ি, গরুগাড়ি, নৌকা, রিকশা কী শিখিনি। কোনও পেশা বাদ রাখেননি। জীবন ইশকুলের ক্লাস শেষ হলে, কে কী শিখলাম, সারাদিন কার কেমন কাটল, সেটার বিস্তারিত বিবরণ লিখে বেলামাসির কাছে জমা দিত হত। বেলামাসি একবার পড়ে, দাদাজির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নিজের সংশোধনী ও মন্তব্যসহ। তারপর দাদাজি চূড়ান্ত নজর বুলিয়ে, ঘরোয়া সভার আয়োজন করতেন। পর্দার আড়ালে মেয়েরা। বাইরের চাতালে ছেলেরা। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বিবরণী একে একে পড়ে যেত। দাদাজি সাথে সাথে দুয়েককথায় তার পর্যবেক্ষণ ব্যক্ত করতেন। বেলামাসির দায়িত্ব ছিল, ভেতরবাড়িতে মেয়েদের নিয়েও 'মফিল' (দাদাজি এ-ধরনের বৈঠককে 'মফিল' বলতেন) করতে বলতেন। প্রতিটি মেয়ের বিবরণী দাদাজি খুবই গুরত্বের সাথে পড়তেন। ছেলে ও মেয়ে সবার অভিজ্ঞতা আলাদা কাগজে সুন্দর করে লিখে দিতে বলতেন। সেগুলো জমা নিয়ে সযত্নে রেখে দিতেন ফাইলবন্দী করে। পরের বছর নতুন দলকে জীবন ইশকুলের পাঠে পাঠালে, তাদের অভিজ্ঞতাপর্ব লেখানো ও জমা নেয়ার পর, সবাইকে আগের বছরগুলোতে লেখা ছাত্রদের অভিজ্ঞতাগুলো পড়তে দিতেন। ছাত্রদের জীবনটা কী যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত, বলে বোঝানোর মতো নয়।

.

কান্দাহারে তখন আমরা। প্রচন্ড ঠাণ্ডা পড়ছে। অদূরে রাশান বাহিনীর বিরাট কনভয় ক্যাম্প গেড়েছে। আমীর সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন, ওখানে হামলা চালাবেন। কিন্তু সোজাসুজি যাওয়ার উপায় নেই। রাস্তা দিয়ে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ঠিক হল নদী পার হয়ে হামলা চালানো হবে। দলে আরব মুজাহিদ ছিলেন বেশ কয়েকজন। তারা সাঁতার জানেন না। খরস্রোতা নদী পার হওয়া অসম্ভব। আশেপাশে নৌকা নেই। কমান্ডার সাহেবের কাছে প্রস্তাব দিলাম,
-আপনি একটা দিন সময় দিলে, আমি কাঠের ভেলা বানিয়ে দিতে পারব।
আমীর সাহেব খুবই খুশি হলেন। সবাইকে নিয়ে লেগে গেলাম। মধ্যরাতের আগেই ভেলা তৈরী হয়ে গেল। দাদাজির জন্য অনেক অনেক দু'আ এসেছিল। তার জীবন ইশকুলের ছাত্র হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। ময়দানের সাথীরা একেক সময় অবাক হয়ে জানতে চাইত, আচ্ছা বলুন তো, আপনি ময়দানে আসার আগে আসলে করতেনটা কি? এমন কোনও কাজ দেখি না, যেটা আপনি পারেন না। আমি মিটিমিটি হেসে বলি
-পারি না, এমন বহু জিনিস দুনিয়াতে আছে। আমি কোনও কাজই ভালো করে পারি না। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, এটুকুই। এই যে দেখুন না, শহীদ হওয়ার জন্য, কত চেষ্টা করি, এটা কি আমার সাধ্যে আছে? আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা না হলে, যতই জিহাদ কিতাল করুক, শহীদ হতে পারবে না।
.
চাচীর মধ্যেও দেখতাম দাদাজির গুণটি ছিল। তিনি আমাকে ও রুবাবাকে বিভিন্ন অভিজ্ঞ মানুষের কাছে নিয়ে যেতেন। জীবন ইশকুলের ধারনা চাচীর মধ্যে স্পষ্টভাবে না থাকলেও, তিনি বুঝতেন, ছোটদেরকে নিয়ে যেতে হবে বড়দের কাছে। তাতে তারা সমৃদ্ধ হবে। আগের যুগে রাজার সন্তানরা এভাবেই শিখত। রাজা তাদেরকে অভিজ্ঞ মন্ত্রী বা সেনাপতি বা গোত্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমাদেরকে বযমে মুশা'আরায় নিয়ে যাওয়ার পেছনে চাচির এই যুক্তি কাজ করত।
.
দাদাজির সাথে হাঁটতে হাঁটতে কত কি ভাবনা জাগছিল মনের পাতায়! বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগবে। দাদাজির কাছে কি জানতে চাইব প্রতিমার কথা? থাক, একটু পর ঘরে গেলেই তো জানতে পারব!

দিনলিপি-১৪৮৬

(২২-১১-১৮)
দ্বিখন্ডিত ভালবাসা (৬)!
-
দু'জন বাড়ির পথে হাঁটছি। দাদাজি বোধ হয় সবর করতে পারলেন না, রুবাবা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কী বলব? এ যে বড় কষ্টের অধ্যায়। আমাকে চুপচাপ দেখে দাদাজি প্রবোধ দিয়ে বললেন,
-আমার কাছে বলে হালকা হতে পারো।
-দাদাজি! কি যে বলি! বুক ফেটে যেতে চাচ্ছে। এতদিন কষ্টটা বুকের গহীনে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলাম।
-বললে যদি তোমার কষ্ট বেড়ে যায়, তাহলে থাক।
-কষ্ট যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। অনেকদিন তো গড়িয়ে গেল। কষ্ট আর কতইবা বাড়বে। আপনাকে বলতে পারলে, কষ্টের ভার লাঘব হবে বলে মনে করি। পাকিস্তান গিয়ে প্রথম কিছুদিন পাগলের মতো খুঁজেছি। কিছুই চিনি না। তারপরও একে ওকে ধরে চেষ্টার কমতি করিনি। পরে মাদরাসায় পড়া শুরু হয়ে গেলে, খোঁজাখুঁজি স্থগিত করেছি। মাদরাসায় ছুটি হলে আবার নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আপনি যা টাকা পাঠাতেন, তা না খেয়ে জমিয়ে জমিয়ে রুবাবার সন্ধানে ব্যয় করেছি। বিহারি পাড়ায় যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। করাচি তখন দাঙ্গার শহরে পরিণত হয়েছিল। মুহুর্মূহু বোমা ফাটছে। কাঁদানে গ্যাস ফুটছে আর গলগল করে টায়ার পোড়া ধোঁয়া বের হচ্ছে। মাদরাসার হুজুরগনই আমাদেরকে মাদরাসার চারদেয়ালের বাইরে বের হতে দিতেন না। করাচির আকাশ বেশিরভাগ সময়ই কালোধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। দিন নেই রাত নেই, বোমা-ককটেল ফাটছেই। এদিকে শী'আ-সুন্নী লড়াই তো আছেই। এর মধ্য দিয়েই পাকিস্তানে বাস করছে মানুষ। রুজি-রোজগার করছে।
.
রুবাবার খবর আমি আফগানিস্তানে যাওয়ার আগেই পেয়েছিলাম। আপনাকে জানাইনি। ভেবেছি জানলে পাছে আপনি কষ্ট পান। আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। সাথীরা দলে দলে আল্লাহর রাস্তায় মেহনতে বের হচ্ছে। কিছু সাথী ইতিমধ্যে শহীদও হয়ে গেছেন। সারাবিশ্ব থেকে উম্মাহর সেরা সন্তানগন আফগানের মাটিতে আসছেন। একেবারে সাহাবায়ে কেরামের যুগ নতুন করে জন্ম নিয়েছে যেন। প্রতিনিয়ত ঈমান-আফরোজ বিভিন্ন ঘটনা শুনতে শুনতে আর তর সইছিল না। শহাদানের অপূর্বসব ঘটনা শুনে, আমাদের প্রত্যেকের শাহাদাতের তামান্না উত্তু'ঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সত্যি বলতে কি

দাদাজি, জিহাদ আর শাহাদাতের বিস্ময়কর তামান্না আর পিপাসা, আমাকে রুবাবার কঠিন শোকও ভুলিয়ে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছি, এটা আল্লাহরই ফয়সালা। আল্লাহরই বিশেষ রহমত। নইলে দাদাজি, নিজের বিবাহিতা স্ত্রী, অন্যের ঘরনি হয়ে গেছে, আমি বেঁচে থাকতে, ব্যাপারটা একজন পুরুষের পক্ষে মেনে নেয়া প্রায় অসম্ভব বৈ কি।

.

পড়াশোনাও একপ্রকার শেষ। আপনি আগেই অনুমতি দিয়েছেন। তাই আগপিছ না ভেবে পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছি। রুবাবার খবর পেয়েছিলাম আমাদের মাদরাসায় এক ছাত্র ভাইয়ের মাধ্যমে। সেও বিহারী মুহাজির ছিল। তার বাবা-মাও থাকত বিহারি পাড়ায়। তার মাধ্যমেই মূলত অনুসন্ধান করতাম। সে-ই একদিন রুবাবার খবর আনল। আমি বিশ^াস করিনি তার সংবাদ। আসলে বিশ^াস করতে মন চায়নি। বিশ^াস করতে না চাইলেই যদি, কোনও সংবাদ মিথ্যা হয়ে যেত, কতইনা ভালো হত। সে বলল,

-রুবাবা নামের একজন বিহারী ক্যাম্পের বাইরে থাকে। তার স্বামীও বিহারী। এমকিউএমের তরুণ নেতা। নিজস্ব বাড়িও হয়ে গেছে তার ইতিমধ্যে। সন্তান আছে কি না, খবর বের করতে পারিনি।

আমি তার সাথে তর্ক জুড়ে দিলাম,

-আমি যেই রুবাবাকে খুঁজছি, সে-ই যে এই একিএম নেতার বিবি, তার নিশ্চয়তা কি?

-ভাইসাব! আমাকে বলেছ খোঁজ বের করতে, আমি কোশেশ করেছি। এটা বের করতে, আমার কত যে কষ্ট হয়েছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত আমি এটা করেছি। সময়ের হিশেব করে দেখ, পাক্কা দো দো বরচ আমি এর পেছনে লেগে ছিলাম। তোমার কষ্ট দেখে, খারাপ লাগত। তুমি আমাকে আর্থিকভাবে অনেক নুসরত করেছ শুধু সেজন্যই নয়, দোস্তের প্রতি আরেক দোস্তের ওফাদারির তাকিদ থেকেও আমি এটা করেছি। আরেকটা ব্যাপার, একিএম নেতার বাড়িতে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। এই সতর্কতা নিরাপত্তাজনিত নাকি অন্য কিছু, সেটা বুঝতে পারিনি। আর এই রুবাবা করাচি আসার আগে ঢাকা ছিল। তার বাবার নামও মাওলানা আসলাম। তিনি করাচির আরেক প্রান্তে থাকেন। তার ঠিকানা বের করতে পারিনি। বের হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ।

.

আসলাম চাচ্চুর ঠিকানা বের হল। দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বজ্রাহতের মত হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাই বলতে পারেননি। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরেছেন। চাচাজি কেমন যেন হয়ে গেছেন। শরীর ভেঙে গেছে। বুড়িয়েই গেছেন প্রায়। প্রথমে বিশ^াসই করতে চাননি, তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে 'আমিই'। বারবার আমার হাত ধরে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু বলতে পারছিলেন না। আমিই যেচে বললাম,
-চাচাজি, আমি রুবাবার খবর পেয়েছি। আপনি বিব্রতবোধ করবেন না। বুঝতে পারছি কোথাও কোনও সমস্যা হয়েছে।
.
অবস্থা দেখে বুঝতে পারছিলাম, চাচাজি চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে আছেন। গায়ের জামাটা পুরনো। নিজের ওই করুণ অবস্থা নিয়ে আমার সামনে থাকতে বসে থাকলে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ভেতরে ভেতরে অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, মুখেও তার ছাপ ফুটে উঠছিল। আমারই খারাপ লাগছিল। কিন্তু সবকিছু না জেনে ফিরে যাওয়াও যৌক্তিক মনে হচ্ছিল না। চাচাজি কোথাও যেন ছোটখাট একটা চাকুরি করতেন। তার বেরোবার সময় হয়ে গেছে। বুঝতে পেরে বললাম,
-আমি আরেকদিন আসি?
-জরুর আসবে।
-চাচীজান কোথায়? তাকে দেখছি না যে?
-ও ইন্ডিয়ায়। হায়দ্রাবাদে। বাবার বাড়িতে। বিস্তারিত আরেকদিন বলব বেটা। ইনশাআল্লাহ।
.
মাদরাসায় ফিরতে ফিরতে, রুবাবার চেয়ে চাচাজির করুণ হালত দেখেই বেশি খারাপ লাগছে। রুবাবার ঘটনায় বুঝতে পারছি, এমন কিছু ঘটেছিল, যা অনাকাঙ্খিত। হয়তো আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন। অথবা অন্যকিছু। পরে সময় করে আরেকবার গেলাম। চাচাজি সরাসরি কথা তুললেন। তিনি বোধ হয় প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।
-বেটা, সবকথা খুলে না বললে, তোমাকে সঠিক পরিস্থিতিটা বোঝানো যাবে না। আমরা ঢাকা থেকে বের হওয়ার পর, উদ্ভ্রান্তের মতো অবস্থা হয়েছিল। তোমার আব্বু যাকে রাহবর হিশেবে দিয়েছিল, সেই লোক আমাদেরকে সীমান্ত পার করে দিলেও, গাদ্দারি করেছে। আমার কাছে নগদ যত টাকা ছিল, সব নিয়ে গেছে। আল্লাহর খাস রহমত না হলে, স্বর্ণগুলোও নিয়ে যেত। পথশ্রমে তোমার চাচী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

একটানা একদিন একরাত হাঁটতে হয়েছিল। রুবাবা দু'বার মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিল। খাওয়া নেই। পানিও ছিল না। রাহবর আমাদেরকে মূল সড়ক ছেড়ে, ভিন্ন পথে এনেছিল। গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে, কখনো পাকবাহিনীর ভয়ে, ঘুরপথ ধরে এগুতে হয়েছে। শুধু আমরাই নই, আরও কিছু লোক সীমান্তের যাচ্ছিল। পাকবাহিনীর অবস্থা তখন খারাপের দিকে। তাই ইন্ডিয়ার দিকে হিজরতকারীর সংখ্যা কমে আসছিল। অনেক কষ্টে আগরতলা পৌঁছলাম। সেখানে কিছুদিন থাকতে হল। হাতে টাকা নেই। স্বর্ণ বেচবো, সে উপায় নেই। একবার বিক্রি করলে, সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাব। অনেক দূরে গিয়ে তোমার চাচীর একটা নাকফুল বিক্রি করে নামমাত্র মূল পেয়েছিলাম। সেটা খরচ করে, হায়দ্রাবাদ পৌঁছলাম। শ^শুরবাড়িতে ক'দিন থাকলাম।

.

আমি দ্রুত পাকিস্তান পৌঁছাতে চাচ্ছিলাম। ঢাকা থেকে আসার সময়, রুবাবা পুরো রাস্তা কারো সাথে কোনও কথা বলেনি। একদম চুপ মেরে গিয়েছিল মেয়েটা। আমাদের উপর এমন বিপর্যয় নেমে আসবে, সে মেনে নিতে পারছিল না। আমি ঠিক করলাম, আর দেরি না করে করাচি চলে আসতে। তোমার চাচীও চলে আসতে চাইল। কিন্তু তার অবস্থা এতটাই শোষণীয়, শোয়া থেকেও উঠে বসতে পারছিল না। আমি চাচ্ছিলাম, আমি আগে যাই। ওদিকে একটু গুছিয়ে উঠতে পারলে, রুবাবা আর তার আম্মু পরে আসবেন। রুবাবা বেঁকে বসল। সেও আমার সাথে চলে আসার বায়না ধরল। দোটানায় পড়ে গেল, মায়ের অসুস্থতা দেখে। রুবাবার মারও ইচ্ছা, আমি রুবাবাকে সাথে করে নিয়ে যাই। আমি পড়ে গেলাম বিপাকে। কোথায় যাব, কোথায় থাকব, কীভাবে সীমান্ত পার হব, তার ঠিকঠিকানা নেই। কিছুতেই মন সায় দিল না। রুবাবার আম্মু বলল, মেয়েকে এখানে রাখলে কিছু সমস্যা দেখা দিবে। সাথে করে নিয় না গেলেও, রুবাবাকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতে হবে। ওর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমার শ^শুরবাড়িতে, লুবাবার (রুবাবার আম্মুর) চাচা-জ্যাঠারা প্রায় সবাই একসাথে গাদাগাদি করে থাকত। আগে মানুষ কম ছিল, হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যেত। এখন শরীক বেড়েছে। থাকার স্থান কমে এসেছে। কেউ কারো থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখবে, সে উপায় কম। রুবাবাকে এই একান্নবর্তীর মতো পরিবেশে রাখা বিপদজনক। রুবাবার বিয়ে হয়ে গেছে, এটা বলেও পার পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও একের পর এক বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। আশপাশ থেকেই। তাদের বক্তব্য, আমাদের মেয়েকে বাঙালের কাছে বিয়ে দিতে হবে কেন। আর ওখানে এখন যুদ্ধ চলছে। যে 'খসম' তার 'জরুকে' হেফাযত করতে পারে না, তার খসম

(জামাই) হওয়ারই যোগ্যতা নেই। একবার যখন চলে এসেছে, আবার কে বাঙলাদেশে যাবে। দরকার নেই বাঙাল খসমের। আমাদের মেয়ে, আমাদের কাছেই থাকবে।

.

মাত্র কয়েকদিনেই এই অবস্থা, রুবাবাকে এখানে রাখা নিরাপদ নয়, এ নিয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। অবস্থা বেগতিক। উভয়সংকটে পড়ে গেলাম। রুবাবাও প্রচ- দোটানায় পড়ল। আমার সাথে যেতেও ইচ্ছুক, আবার মাকে এই অবস্থায় ফেলে যেতেও মন সরছিল না। রুবাবার মনেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল। এখানে থাকলে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু ঘটে যেতে পারে। তুমিও নাকি রুবাবাকে একবার বলেছ, তুমি বাংলাদেশে পড়া শেষ করে, দেওবন্দ পড়ার পর, পাকিস্তানে পড়তে যাবে। তাই সে মনে করেছে, যেহেতু এখানে থাকা নিরাপদ নয়, পাকিস্তানে গিয়ে তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে থাকবে। আমার শাশুড়িও বললেন, পথ যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক, রুবাবা আমার সাথে চলে যাওয়াই নিরাপদ। কারণ শাশুড়ির উপরই বেশি চাপ আসছিল। সব প্রস্তাব তাঁর কাছেই জমা হত। রুবাবাক বিয়ে করতে পারলে পাত্রের লাভ ছিল। শরীকানা বাড়িতে রুবাবার মায়েরও একটা অংশ ছিল। সেটার লোভও কম নয়। নানা অংক আর হিশেব ছিল রুবাবাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়ার পেছনে। ভাগ্যিশ রুবাবার বিয়েটা হয়ে গেছিল, নইলে ওকে হায়দ্রাবাদ থেকেই বের করে আনা যেত না। আমরা বলেছি, তুমি পাকিস্তানে পড়াশোনা করতে যাবে। তাই রুবাবার পাকিস্তানে যাওয়া ঠেকাতে শক্তিশালী কোনও যুক্তি তাদের কাছে ছিল না। তখনও আমি শতভাগ নিশ্চিত ছিলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না। কারণ আমেরিকা ও চীন চাইবে না, বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাক। বাংলাদেশ থেকে বের হওয়ার আগেই খবর পেয়েছিলাম, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর জাপানের ইয়াকোসুকা থেকে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

.

কাশ্মীর এলাম। আগে থেকে দালাল ঠিক করা ছিল। কোনও বিপদ ছাড়াই সীমান্ত পার হলাম। কষ্ট বলতে, দীর্ঘ পথ বনেবাদাড় দিয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে। পাহাড় ডিঙ্গাতে হয়েছে। পাহাড়ি নদী পার হতে হয়েছে। করাচি পৌঁছলাম। করাচি তখন দ্বিতীয় বিহার। যেদিকেই তাকাই, বিহারের মুহাজির আর মুহাজির। আমার বড় ভাইয়ের ছেলে আরও আগে থেকেই করাচিতে থাকত। অল্প বয়েসেই সে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তার ঘরে উঠলাম। ভালো মানুষের মতো বিশ^াস করে, নিজের কাছে যা ছিল, সব তার যিম্মায় রাখলাম। ভাতিজাই আগে বেড়ে সব তার কাছে রাখতে বলল। আপন ভাতিজা, সন্দেহ থাকার কথা

নয়। তার ব্যবসার পুঁজি, ঘর কেনার টাকা, আমিই ঢাকা থেকে পাঠিয়েছি। সে বিশ^াসঘাতকতা করবে, ঘুণাক্ষরেও আশংকা করিনি। অনেক স্বর্ণ ছিল আমার কাছে। সে চুরির ঘটনা সাজিয়ে, সব স্বর্ণ হাতিয়ে নিল। সাজানো ঘটনা সেটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। শুধু স্বর্ণের উপর দিয়ে আঘাত গেলে, কথা ছিল না। কিছুদিন পর সে রুবাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করলাম। হায়দ্রাবাদের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। রুবাবা বিবাহিত এটা ভাতিজা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। তার আগে থেকেই খেয়াল ছিল রুবাবাকে বিয়ে করবে। আমারও তখন আপত্তি ছিল না। কিন্তু নিজের জীবনকে ঢাকার সাথে বেঁধে ফেলাতে, মত বদলেছিলাম। আমরা থাকব ঢাকায়, মেয়ে থাকবে করাচিতে, এটা হতে পারে না। এরমধ্যে তোমার সাথে আকস্মিক বিয়ে হয়ে গেল। ভাতিজাকে ধর্মের দোহাই দিলাম। বিবাহিত মেয়েকে বিয়ে করা হালাল নয়। কিন্তু সে অনড়। যে কোনও মূল্যে বিয়ে করবেই। রুবাবাকে বিয়ে করার জন্য সে অন্য কোথাও বিয়েই করেনি।

.

আমি ঢাকায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। তখনো ঢাকা পাকিস্তানী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তখনই খবর পেলাম, তোমার আব্বুর কথা। আহা, মৃত্যুর আগে এমন সংবাদ না শুনতাম! আমাকে বাঁচাতে গিয়ে, তোমার আব্বা, আমার জিগরি দোস্ত, শহীদ হয়ে গেলেন। ওফাদার দোস্তের এই ত্যাগের প্রতিদান দুনিয়াতে দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বর্ণহারিয়ে আমি দেউলিয়া। এখন মেয়েকেও কুরবানি করতে হবে। ভাতিজাই ক'দিন পর খবর আনল, তুমিও মারা গেছ। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী সেনারা তোমার দাদাকে আবারো ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। তুমি বাধা দিতে এলে, তোমাকেও মেরে ফেলেছে। তোমার দাদাকে যে আগে একবার ধরা হয়েছিল, সেটা ভাতিজার জানার কথা নয়। বুঝতে পারলাম, সে কোনওভাবে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাবিভাগের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আসলেই সে ভেতরে ভেতরে পাক সেনাবাহিনীর এজেন্ট ছিল। বিহারীদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব ছিল তার উপর। সে একিউএমের প্রতিষ্ঠাতা আলতাফ হোসেনের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলত। সবদিক দিয়েই আমি কোনঠাসা হয়ে পড়লাম। ভাতিজা সরাসরি কোনওদিন আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেনি। অশ্রদ্ধা করেনি। তারপরও আমি বললাম, একজন অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবের ফতোয়া ও পরামর্শমতে যদি বিয়েটা বৈধ হয়, তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই।

.

ভাতিজা মেনে নিল। সে করাচি নিউ টাউনের ইফতা বিভাগে গিয়ে ফতোয়া নিয়ে এল। যেহেতু স্বামী মারা যাওয়ার নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেছে, সে হিশেবে মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে। আগে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। রুবাবাকে জানানো হল, তোমার মৃত্যুসংবাদ। আমি সংবাদের ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছুই বললাম না। আসলে আমার করার কিছুই ছিল না। সবই ভাতিজা করছিল। আমি রোবটের মতো দেখে যাচ্ছিলাম। বিদ্রোহ করতে পারতাম, মেয়েকে নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু করাচি শহর পার হতে পারতাম কি না সন্দেহ। একে তো ভাতিজা খুবই চৌকশ ছেলে। তার উপর ছিল সেনাবাহিনীর ইনফর্মার। বিহারী ক্যাম্পে ভাতিজার আরও বেশ কয়েকজন সহকারী ছিল। পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। আর বিষয়টা নিয়ে আমি ঠা-া মাথায় ভাবলাম। ততদিনে দেশ দুই ভাগ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। যাবতীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। আমাদের কারও ঢাকায় যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি বেঁচে থাকলেও তোমার করাচি আসা অসম্ভব। এদিকে তুমি মারা গেছ, সে ব্যাপারে ভাতিজা নিশ্চিত সংবাদ এনেছে। পাত্র হিশেবে ভাতিজা মোটেও ফেলনা নয়। এত অল্পবয়েসী একটা মেয়ে বিয়ে ছাড়া বাকি জীবন কিভাবে কাটাবে? আমি যদি ভাতিজার প্রতারণার শিকার না হতাম, তাহলে টাকার জোরে হলেও কিছু করার জোর চেষ্টা করে দেখতাম। সবদিক দিয়ে আমার হাত-পা বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। তোমার আর রুবাবার বিষয়টা যখনই আমি একান্তে ভাবতে বসেছি, মনে হয়েছে, রুবাবাকে যদি আসার দিন কোনভাবে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতাম! কিন্তু যে পরিস্থিতিতে ঢাকা ছেড়েছি, তাতে বাংলাদেশ ছাড়া ছাড়া, ভিন্ন কিছু ভাবতে পারিনি। আর নিশ্চিত ছিলাম, সব সম্পত্তি বিক্রি করলেও, আমরা আবার ফিরে আসব। আপাতত কিছুদিন ভারতে থাকি। কিন্তু যতই দিন গড়াতে লাগল, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে ঝুঁকতে লাগল। তার প্রভাবে আমাদের পরিকল্পনাও বদলাচ্ছিল।

.

তোমার মৃত্যুসংবাদ শুনে রুবাবা বাড়তি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। একফোঁটা চোখের পানি ফেলল না। কিভাবে মারা গেছ, সেটা পর্যন্ত জানতে চাইল না। ঢাকা ছাড়ার পর থেকে মেয়েটা নির্বাক হয়ে ছিল, আমার সাথে মাঝেমধ্যে কথা বলত, তোমার সংবাদ শোনার পর থেকে, একেবারে বোবা হয়ে গেছে যেন। এখনো সে সারাক্ষণ চুপচাপই থাকে। যন্ত্রের মতো সংসারের কাজ করে। স্বামী-সন্তানের সেবা করে একমনে। বড় চাপা স্বভাবের মেয়ে। তার অনুভূতি আর দশটা মেয়ের চেয়ে আলাদা। অনেক বেশি গভীর। চুপচাপ থাকলেও, বিয়ের কথা ওঠালেই সে প্রচ- রেগে যেত। তার হাবভাবে মনে হত,

বেশি জোরাজুরি করলে, সে মরে যেতেও দ্বিধা করবে না। এটা দেখে ভাতিজাও ভয় পেত। ভাতিজা আমার সাথে প্রতারণা করে স্বর্ণ হাতিয়ে নিলেও, আসলেই সে রুবাবাকে পছন্দ করত। রুবাবা এক দুই করে পাক্কা চার বছর বিয়ে ঠেকিয়ে গেছে। ভাতিজাও অধৈর্য হয়নি। পরম ধৈর্যের সাথে রুবাবার প্রত্যাখ্যানকে তিক্তহৃদয়ে চুপচাপ মেনে নিয়েছে। আসলে রুবাবার মধ্যে কী যেন একটা আছে, যা অন্যের সমীহ আদায় করে নেয়। অন্যকে তার দিকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

.

চাচাজি আরও বললেন,

লুবাবা (রুবাবার আম্মু)-কে পাকিস্তানে আনা যাচ্ছে না। চোরাই পথে আসতে হলে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, সেটা লুবাবার পক্ষে সম্ভব নয়। পাকিস্তানের ভিসা নিয়ে আসবে, এমন কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিল না। আল্লাহর ফয়সালা! আমরা দুইজন দুই দেশে। কী সুন্দর সাজানো গোছানো সংসার ছারখার হয়ে গেল। মেয়েটাকেও সুখী দেখতে পারলাম না। ভাতিজা প্রস্তাব দিয়েছে, রুবাবা যদি বিয়েতে রাজি হয়, তাহলে যে কোনও মূল্যে রুবাবার মাকে হায়দ্রাবাদ থেকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। আমি দিনরাত রুবাবাকে বোঝালাম। মায়ের কথা ভেবেই হয়তো, রুবাবা বিয়েতে মত দিল।

.

আমি ভাতিজাকে অনেক অনুরোধ করে, রুবাবাসহ আলাদা বাড়িতে উঠে এলাম। এভাবে ভাতিজার ঘাড়ে বসে খেতে ভীষণ লজ্জা লাগছিল। নিজেই রোজগারের চেষ্টায় নেমে পড়লাম। এভাবেই দিন চলে যাচ্ছে। বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর বাড়িতে চলে গেল। আমি বিহারী ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে এলাম। লুবাবাকে এখনো আনার কোনও ব্যবস্থা করা যায়নি। মেয়েজামাই অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেখা যাক, আল্লাহর কী ফয়সালা!

.

.

-দাদাজি! এই ছিল আসলাম চাচ্চুর জবানিতে শোনা ইতিবৃত্ত। এরপর আমার সাথে চাচাজির আর দেখা হয়নি। আসার সময় ভেবেছিলাম একবার দেখা করে আসব। পরে ভাবলাম থাক, কী দরকার কষ্ট বাড়িয়ে?

- আমিও এদিক থেকে কিছু চেষ্টা করেছিলাম। তোমার সাথে যখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আমি চেষ্টা করলাম, রুবাবাদের কোনও খোঁজ বের করা যায় কি না। প্রথমে ঢাকা গেলাম। ঢাকায় কোথায় কোথায় বিহারীরা থাকে, খোঁজ নিলাম। মিরপুর আর মোহাম্মদপুরে। দীর্ঘ সময় লাগিয়ে দুই ক্যাম্পে ঘোরাঘুরি করলাম। ছোট-বড় অসংখ্য

মানুষের সাথে কথা বললাম। মাওলানা আসলাম নামে তারা কাউকে চেনে না। আমার মনে হয়, বিহারী ক্যাম্পের প্রতিটি বয়স্ক পুরুষের কাছে গিয়েছি। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে গিয়ে তাদের নথিপত্র দেখেছি দিনের দিন। অবাক করা ব্যাপার, এতবড় একজন মানুষ, এতবড় ব্যবসায়ীকে কেউ চিনবে না? আসার দিন একজন পরামর্শ দিল, সৈয়দপুর যেতে। ওখানে বিহারীরা ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে।

.

বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতে দু'টি মহিলা একা একা থাকছে। বেশিদিন ঘরের বাইরে থাকলে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিমার জন্য সবসময় ভয় কাজ করত। এই বুঝি তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিম বাংলা থেকে কেউ এল। তোমার দাদু আর তোমার আম্মু তোমার দুশ্চিন্তায় দিনদিন জর্জরিত হতে থাকল। তোমার আম্মু মনে মনে আশা করেছিল, আমি রুবাবার কোনও খোঁজ নিয়ে ফিরব। পাশাপাশি তোমার সংবাদও। আর প্রতিমা ভেবেছিল আমি তোমার খোঁজে গিয়েছিলাম। সেও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। তোমার বিয়ের কথা তাকে জানানো হয়নি। ভেবেছিলাম ও পরিপূর্ণ বিয়ের বয়েসে পৌঁছলে জানাব। তুমি জানো নিশ্চয়ই, রুবাবার সাথে বিয়ের খবরে তোমার দাদু খুবই ভেঙে পড়েছিল। তার একান্ত ইচ্ছে ছিল, প্রতিমার সাথেই তোমার বিয়ে হবে।

.

সৈয়দপুরে গেলাম। বিরাট জংশন। ধীরেসুস্থে গুছিয়ে বসে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কাজ হল না। কাউকে পেলাম না। তবে পরিশ্রম বৃথা গেল না। এক বৃদ্ধ পরামর্শ দিল, আবার ঢাকায় যেতে। মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পের এক বিহারীর ঠিকানা দিল। সে আমাকে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। এদেশ ও ভারত থেকে যাওয়া বেশিরভাগ বিহারী করাচিতে আছে। তাদের একটা রাজনৈতিক দলও হয়েছে। মুত্তাহিদা কওমী মুভমেন্ট। তখন করাচিতে এমকিউএম তুমুল তা-ব চালাচ্ছে। সরাসরি পাকিস্তানে ফোন করা ঝামেলার ছিল। ঢাকার বিহারী লোকটি আমাকে আরেক লোকের কাছে নিয়ে গেল। যার কাছে গেলাম, সে বাঙালি। আমার সব কথা শুনে বলল,
-কোনও ব্যাপারই নয়। যদি জীবিত থাকে এবং করাচিতে থাকে, আমি একমাসের মধ্যে তার হদিস বের করে ফেলব। টাকা খরচ করতে হবে। নিয়মিত ফোন করতে হবে। অনেক সময় সরাসরি যোগাযোগ করতে পারব না। তাই লন্ডন হয়ে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
-ঠিক আছে। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। কোনও সংবাদ পেলে আমাকে খবর পাঠাবেন।

.

পঁচিশ দিনের মাথায় মানুষটা খবর পাঠাল। সাথে সাথে ঢাকা এলাম। লোকটা অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে। পরো করাচি শহর চষে মাওলানা আসলামের হদিস বের করে ফেলেছে। মানুষ কোনও কাজে লেগে থেকে চেষ্টা চালিয়ে গেলে, আল্লাহ আল্লাহ বান্দাকে নিরাশ করেন না। আসলাম করাচিতে বিহারীপাড়ায় থাকত না। ভিন্ন একজায়গায় থাকত। সেজন্য বের করতে কষ্ট হয়েছে। সময় ঠিক করে ফোনে ধরলাম তাকে। সালাম দিয়েই রুবাবার কথা জানতে চাইলাম। হু হু করে কেঁদে দিল। তার কিছুদিন আগেই বোধ হয় তোমার সাথে তার কথা হয়েছে। সেটা জানতে পারলাম। আসলাম অনেক কথা বলল। তোমার আর রুবাবার ব্যাপারটার যন্ত্রণা তাকে প্রতিটি মুহূর্তে কুরে কুরে খাচ্ছে। রুবাবাকে জানানো হয়নি, তুমি বেঁচে আছ। কী দরকার, নতুন করে তাকে কষ্টে ফেলার? শরীয়তসম্মতভাবে বিয়ে হয়ে গেছে। সেও সংসারে মন দিয়েছে। দু'টি সন্তান হয়েছে। রুবাবা সুখেই আছে। তবে আগের মতোই, কথা একদম বলে।
-দাদাজি, আমি একটি কাজ করেছিলাম, সেটা বলা হয়নি।
-কোনটা? তালাকের ব্যাপারটা?
-জি¦, চাচ্চু বলেছেন আপনাকে?
-জি¦। তারপরও তুমি আবার বল, তোমার মুখেই শুনি।
-চাচার কাছ থেকে প্রথমবার যাওয়ার পর, বিভিন্ন মাদরাসার ইফতা বিভাগে গিয়ে, ফতোয়া জানতে চেয়েছিলাম। সবাই বলল, বিয়ে বৈধ হয়ে গেছে। আমি চার বছরেরও বেশি সময় নিখোঁজ ছিলাম। পাশাপাশি তাদের কাছে নিশ্চিত (অন্তত সে সময়ের প্রেক্ষিতে) সংবাদ পৌঁছেছিল। এখন আমার উচিত হল, নিজে থেকে বিবিকে তালাক দিয়ে দেয়া। সতর্কতা হিশেবে। আমি পরেরবার চাচাজির কাছে গিয়ে, লিখিতভাবে রুবাবাকে তালাক দিয়েছি। রুবাবার জীবনটা সুন্দর আর মসৃণ হোক, এই ছিল আমার কামনা। বেচারী এমনিতেই নানা ধাক্কা খেয়েছে। আমি সামনে হাজির হয়ে, তাকে নতুন করে সংকটে কেন ফেলতে যাব? তার চেয়ে নিরবে সরে যাওয়াই উভয়ের জন্য নিরাপদ মনে হয়েছে। চাচাজিকেও আমার কথা রুবাবাকে জানাতে নিষেধ করেছি।
-আমি আসলামের সাথে যোগাযোগ করে, আরেকটা কাজ করেছি, সেটা তোমার জানা থাকা দরকার। আমি নির্ভরযোগ্য একটা মাধ্যমে, আসলামের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছি। সে পেয়েছে টাকাটা। বুঝতে পেরেছিলাম, সে খুবই কষ্টে আছে। ভাতিজার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে তার আত্মসম্মানে লাগছিল। আবার নিজেও সুবিধাজনক কিছু করে উঠতে পারছিল না। আমি তাকে বলেছি, এটা তারই টাকা। তোমার আব্বুর সাথে তার কিছু যৌথ জায়গা ছিল। বিভিন্ন লোকজন ধরে, আমি জায়গাগুলো এককভাবে তোমার

আব্বুর নামে নামজারি করিয়েছি। আরও কয়েক জায়গায় মোটা অংকের টাকা পাওনা ছিল। সেগুলো উদ্ধার করেছি। এসব টাকা থেকেই আমি আসলামের জন্য পাঠিয়েছি। আমি চলে যাওয়ার তুমিও এদিকটা খেয়াল করো। টাকা পাঠানোর সূত্রটার সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব। আগামী মাসে ঢাকা যাওয়ার সময় তোমাকে নিয়ে যাব। ঢাকার সম্পত্তিগুলো বুঝে নেবে। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি।

.

.

.

প্রিয়জনের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে অনেকদিন পর ফিরে এলে, নস্টালজিয়া পেয়ে বসে। সেই ছেলেবেলায়, আমি আর রুবাবা, দাদাজির দুপাশে দুই হাত ধরে মসজিদে এসেছিলাম। তাহাজ্জুদ শেষে ঘরে ফিরেছিলাম। একবার নয়, অনেকবার। রুবাবা দাদার সাথে তাহাজ্জুদে এলে, দাদাজি ফজরের আযান হওয়ার সাথে সাথে রুবাবাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতেন। মুসল্লিরা আসার আগে আগেই। আজও দাদাজির হাত ধরে ঘরে ফিরছি। সেই ভোর রাতে। সেই একই পথে। কিন্তু সেই আগের মানুষটা আর নেই। আগের সেই আমিও আর আমি নেই। রুবাবার স্মতিগুলো একের পর এক হৃদয়পটে ভেসে উঠতে লাগল। সে আজ অন্যের ঘরনি। তার কথা কল্পনা করা আমার জন্য হারাম। এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে?

দিনলিপি-১৪৮৭

(২৩-১১-১৮)

দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (৭)!

-

সুবহে সাদিক হতে আর বেশি দেরি নেই। আল্লাহ তা‘আলার কী অদ্ভুত মহিমা! দাদাজির সাথে দেখা করিয়ে দিয়েছেন ভোররাতে। সেই ছেলেবেলার মতো। ভোররাতই দাদাকে আপন করে পাওয়া যায়। ভোর রাতে দাদা থাকেন সবচেয়ে বেশি হাসিখুশি। এটা কি তাহাজ্জুদের প্রভাবে? কুরআন কারীমের প্রভাবে? হাসিখুশি থাকেন মানে, এমন নয়, দাদাজি হাসাহাসি করেন। পুরো ভোররাতই দাদাজি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে

কাটান। নামাজে, তিলাওয়াতে, মুনাজাতে। আবার ছেলেবেলায় দাদাজির সাথে তাহাজ্জুদের এলে, তিনি আমার প্রতি সারাদিনের তুলনায় অনেক বেশি মনযোগ দিতেন।
.
কথা বলতে বলতে কোন ফাঁকে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আহ, কতদিন পর বাড়ির উঠোনে পা দিলাম। প্রথমেই দাদুর কামরায় গেলাম। তাহাজ্জুদ শেষ করে তাসবীহ পড়ছিলেন। দাদীজানের একটা মজার অভ্যেস ছিল, তিনি ভোররাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, ফজর পর্যন্ত জায়নামাযে বসে বসে যিকির করতেন। হাতের কাছে 'করই' (চালভাজা) রাখতেন। একটু পর পর চিমটি দিয়ে নারকেল-চিনিমাখা কয়েকটা 'করই' মুখে পুরে দিতেন। আম্মুই প্রতিদিন তাহাজ্জুদের আগে ঘুম থেকে উঠেই দাদুর জন্য করইভাজা প্রস্তুত করে রাখতেন। আজও দেখি দাদু বসে বসে করই খাচ্ছেন আর যিকির করছেন। বাড়িতে প্রবেশ করেই দাদাজি অনুচ্চ স্বরে হাঁক দিয়েছেন,
-বৌমা! দেখ কাকে নিয়ে এসেছি!
আম্মু বোধ হয় নামাযের কেরাতে ছিলেন। দাদাজির ডাক শুনতে পাননি। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাহাজ্জুদ পড়ে একটু গড়াগড়ি করে নেয়া আম্মুর বহুত পুরনো অভ্যেস। আজও কি তাহাজ্জুদ পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন? সোজ গিয়ে দাদুর সামনে দাঁড়ালাম। দাদু সেই চিরাচরিত নিয়মে পা মেলে দিয়েছেন। লম্বালম্বি দুই পায়ের ওপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়েছেন। শিশুদের মতো পা নাড়াচ্ছেন আর যিকির করছেন। যেন কোনও শিশুকে পায়ের উপর শুইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। আবছা আলো আঁধারিতে আমাকে দেখে প্রথমে বুঝে উঠতে পারলেন না। দাদাজি হাঁক শুনে ঠিকই বুঝে গিয়েছেন, দাদাজির সাথে কে এসেছে। এই আঁধার রাতে আসার মতো অতিথি,আমি ছাড়া এই পরিবারে আর কে আছে? দাদু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। সেই ছেলেবেলার মতো। দাদুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দাদুর হাত আমার মাথা মুখ আর পিঠে ঘুরতে লাগল। ছেলেবেলায় যখন মাদরাসা থেকে ফিরতাম, তখনও দাদু এমনটা করতেন। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে হাতের সাথে হাড় লাগে কি না, পরীক্ষা করতেন। স্বাস্থ্য যতই ভালো থাকুক, দাদু একথাটা বলতেনই,
-আহা, একদম শুকিয়ে গেছিস দেখি! একটা একটা করে হাড্ডি গোনা যাচ্ছে! ঠিকমত খাসটাস না?
.
আজ আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। তবুও দাদু পিঠে হাত দিয়ে কী হাতড়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এদিকের সরব পরিবেশের ছোঁয়ায় আম্মুও সজাগ হয়ে গেছেন। প্রায় ছুটে

এলেন। আগে হলে কোলে তুলে নিতেন। দিন বদলে গেছে। আগে আম্মুর বুকে আশ্রয় নিতাম। এখন আম্মু আমার বুকে আশ্রয় নিলেন। আহা, একেবারে শুকিয়ে গেছেন। দাদু ছেলে হারালেও স্বামীকে পাশে পেয়েছেন, কিন্তু আম্মু? অল্প বয়েসেই স্বামীকে হারিয়েছেন। তারপর ছেলেও দীর্ঘদিন লাফাত্তা!

.

.

সাক্ষাত পর্ব শেষ হতে হতে, দূরের মসজিদ থেকে মাইকে আযান ভেসে এল। আগে আমাদের আশেপাশের কোনও গাঁয়ের মসজিদে মাইক ছিল না। শুধু শহরের মসজিদে মাইক থাকত। দাদাজি জানালেন, আমাদের মসজিদেও একটা মাইক লাগানো হয়েছে। আম্মু আর দাদুর সাথে দেখা-সাক্ষাত শেষ। মন তখনও অন্য কারও প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল। কিন্তু কেউ এল না। দাদাজি মসজিদে যাওয়ার তাড়া দিলেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। দাদাজি আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বললেন,
-ফাতিমা, কিছুদিন আগে ওপারে গেছে। পাগলি মেয়ে, কিছুতেই যাবে না। ওর চাচা আর মামা এসে ওকে জোর কর নিয়ে গেছে। ওর দাদু আর নানু ওকে শেষবারের মতো দেখতে চায়। ওরা দু'জনে কাশীবাসে চলে যাবে, তাই। ফাতিমাকে নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। চলো আগে ফজর পড়ে নিই। তারপর মন খুলে কথা বলা যাবে। পাড়ার সবাইকে ডেকে দিতে হবে।

.

দাদার সাথে পাড়াজাগানিতে অংশ নিলাম। এখানকার কিছুই বদলায়নি দেখছি। শুধু আমার জীবনঘেঁষা মানুষগুলোই কেমন বদলে গেল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে ফজরের জন্য জাগানোর কাছে অংশ নিলে, মনটা কেমন এক শুদ্ধতায় ফুরফুরে হয়ে যায়। আমার ডাক শুনে কেউ মসজিদে এলে, জামাতে শরীক হলে মনে হতে থাকে, আমি ছোট্ট একটি ব্যবসা করে বিরাট লাভের অধিকারী হলাম। দাদার সাথে আমি পাড়াজাগানিতে অংশ নিলে, আমার ডাক শুনে ছোটরাও ঘুম থেকে উঠে যেত। মা-বাবারাই সন্তানদের বলত, দেখ দেখ, সে তোদের মতো ছোট হয়েও আগে আগে উঠে সবাইকে ডাকতে এসেছে, আর তোরা তার মতো হয়েও এখনো ঘুমিয়ে আছিস। দাদাজির মেহনতে পুরো গ্রামটাই প্রায় নামাযী বনে গিয়েছিল। গ্রামের মানুষকে নামাযি বানানোর জন্য দাদাজির মেহনতের শেষ ছিল না। দাদাজি প্রথাগত আলেম নন। প্রতিটি বিষয়ে আলেমগনের সাথে মুশাওয়ারা (পরামর্শ) করে চলতেন। ঢাকায় গেলে বড় বড় ওলামায়ে কেরামের সাথে দেখা করতেন। প্রয়োজনীয় মুশাওয়ারাগুলো তখনই সেরে আসতেন। আলাদা একটা খাতা ছিল দাদাজির।

সেখানে লেখা থাকত, এবার ঢাকা গেলে কোন কোনও বিষয়ে মুশাওয়ারা করবেন। ছোটখাট বিষয় হলে, ঘরে আম্মু, দাদুর সাথে মুশাওয়ারা করতেন। প্রতিমাকেও সাথে রাখতেন। ছোট হলেও তাকে গুরুত্ব দিতেন। পরে প্রতিমা বড় হয়ে গেলে, তাকে পর্দার কারণে সামনে বসাতেন না। পর্দার ওপাশে রেখে তাকে মুশাওয়ারায় শরীক করে নিতেন।

.

গ্রামের মানুষকে নামাযি বানানোর জন্য, দাদাজির কিছু কর্মপন্থা ছিল। সরাসরি ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতেনই, পাশাপাশি ঘরোয়াভাবেও চেষ্টা করতেন। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও বাড়িতে ঘরোয়া 'মফিল' করতেন। মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত হত 'মফিল'। আমি বাড়ি থাকলে আমাকে সাথে করে নিয়ে যেতেন। আব্বু থাকলে, আব্বুকেও সাথে নিয়ে যেতেন। বয়ান করতে দিতেন। আব্বু বয়ান করলে, সেদিন আর দাদাজি বয়ান করতেন না। এভাবে আমাদের গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নিয়মিত দ্বীনের কথা শোনান হতো। এক বাড়িতে বয়ান হলে, পার্শ¦বর্তী বাড়ি থেকেও মহিলারা পানের বাটা হাতে এড়ে জড়ো হতেন। 'মফিলবাড়িতে' গিয়ে দাদাজি কিছুই খেতেন না। কোনও বিনিময়ের তো প্রশ্নই আসে না।

.

আমি দেখেছি, পুরুষের চেয়ে মহিলারা ওয়াজ শুনে বেশি প্রভাবিত হত। ঘরের মহিলারা সংশোধিত হয়ে গেলে, কর্তাব্যক্তির সংশোধন হতে সময় লাগে না। পুরুষদের জন্যও আলাদা মফিল ছিল। দাদাজি আমাদের হাটের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাটে সময় কাটাতেন। হাটের বিভিন্ন কোনে ছোট ছোট মফিল করতেন। একেকটি মফিলের স্থায়িত্ব হতো বড়জোর 'পাঁচমিনিট'। একটি মফিল শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে আবার আরেক কোনে ছুটে যেতেন। প্রতি হাটবারে দাদাজি কমপক্ষে একশটারও বেশি 'হাটমফিল' করতেন। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তারপরও থামতেন না। 'হাটমফিলের' অনেক প্রভাব পড়ত। হাটমফিলের কারণে দূর-দূরান্তের গ্রামেও দাদাজির মেহনতের আওতায় চলে আসত। আমি হতাম দাদাজি হাতের যষ্ঠি। ঘরোয়া মফিলের শুরুতে আমাকে তিলাওয়াত করতে দিতেন। আমাকেও কখনো কখনো কথা বলতে দিতেন।

.

ফজর পড়েই দাদাজি সাথে সাথে বেরিয়ে পড়েন না। এশরাক পর্যন্ত জায়নামাযে বসে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই এটা দেখে আসছি। আজও ব্যতিক্রম হল না। আমার মনে কষ্টের তুফান বয়ে যাচ্ছে। মসজিদের এককোনে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করলাম। এই একটা মাত্র উপায়ই ছিল, মনকে প্রশান্ত করার। পুরো দুনিয়াটাই যেন শুন্য

হয়ে গেছে। স্বর্বশান্ত নিঃস্ব রিক্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। ইশরাক শেষ করে দাদাজির সাথে বের হলাম। একজায়গায় বসে কথা বলার চেয়ে, হেঁটে হেঁটে কষ্টের কথাগুলো বলা সহজ। পায়ের ছন্দের তালে তালে কষ্টগুলোও যেন পেছনে পড়ে যায়। আসলেই কি তাই? হৃদয়কে রক্তাক্ত করা কষ্টগুলোকে কি কোনওভাবে পেছনে ফেলে আসা সম্ভব? ভেবেছিলাম জিহাদের ময়দানে গেলে সবঠিক হয়ে যাবে। আবার ভেবেছিলাম বাড়িতে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কষ্ট তো কমেইনি উল্টো পরিচিতজনের কাছে এসে কষ্টটা আরও বেড়ে গেছে যেন। দাদাজি আমার কষ্টটা বুঝতে পারলেন। সান্ত¡না দেয়ার চেষ্টা করলেন না। প্রতিমার ব্যাপারটা খুলে বললেন,
-তুমি পাকিস্তান চলে যাওয়ার পর, প্রতিমা খুবই মন খারাপ করল। তুমি চলে গেলে প্রতিমা এতটা মন খারাপ করবে, বুঝতে পারিনি। মেয়েটা এতই ভাল, তার কষ্টের কথা আমাদের বুঝতে দিত না। তোমার সাথে ছোটবেলা থেকেই সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তোমার কাছে ও পড়েছে। তোমার কাছে বিভিন্ন বায়না ধরেছে। তুমি ঢাকা থেকে তার জন্য নানা জিনিস নিয়ে আসতে। দুনিয়ার রুপরসগন্ধ বোঝার বয়েসে, তার মা পাক হায়েনাদের হাতে হয়ে গেলেন। তার আগে খেলার সাথী ছোট ভাই পশ্চিম বাংলায় চলে গেল। কাছাকাছি বয়েসের রইলে শুধু তুমি। একটি মেয়ের মনে ও শরীরে বসন্ত আসার সময়টাতেই প্রতিমা তোমাকে কাছ থেকে দেখেছে। তোমার প্রতি ওর নির্ভরতার ধরণটা বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না। প্রতিমা যখন সব হারিয়ে ওর অজান্তেই তোমাকে তার অতি অপনজন ভেবে বসে আছে, তখনই তুমি পাকিস্তানে চলে গেলে।
-দাদাজি, প্রতিমাকে কি বলেছিলেন, আমার একবার বিয়ে হয়েছে?
-জি¦, জানিয়েছি। একটি মেয়ে তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। তোমার সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত জানিয়ে দেয়া অভিভাবক হিশেবে আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তুমি পাকিস্তান চলে যাওয়ার পরপরই প্রতিমাকে সব জানিয়েছি।
-বিয়ের কথা শুনে সে মন খারাপ করেছিল?
-মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। খুব অল্প মেয়েই এটা মেনে নিতে পারবে। প্রতিমার তখন অন্ধ ভালোলাগার বয়েস। ওই বয়েসে কাউকে মনে স্থান দিয়ে ফেললে, শত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাকে সহজে ছাড়তে পারে না। আর প্রতিমা তখন সংসার কী জিনিস, সেটার সাথেই পরিচিত ছিল না। তোমাকে হয়তো মনের গভীর থেকে তার ভালো লাগত। তার রঙিন মনে কল্পনা হওয়া বিচিত্র নয়, সেও মনে করত, তুমিও তাকে পছন্দ করো। বড় হয়ে তাকেই তুমি বিয়ে করবে। কিন্তু ভালো লাগার মানুষ, আরেকজনকে বিয়ে করে

ফেলেছে, এটা এক প্রচ- ধাক্কা ছিল প্রতিমার জন্য। তুমি দূরদেশে চলে গিয়েছ, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, তার জন্য এর চেয়ে বড় কষ্টের বিষয় আর কী হতে পারে?
-দাদাজি, আমার কী করণীয় ছিল?
-তুমি যা করেছ, সেটাই সঠিক ছিল। পড়াশোনা করতে গিয়েছ। পাশাপাশি নিজের হারানো স্ত্রীকে সাধ্যানুযায়ী খোঁজার দায়িত্ব ছিল, সেটা আদায় করেছ। সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফরীযা আদায়ে লাব্বাইক বলতে পেরেছ। সরাসরি জিহাদের ময়দানে শরীক হয়ে, কুফরের বিরুদ্ধে কিতাল করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছ। তুমি চিঠিতে আমার কাছে দু'আ চেয়েছিলে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ময়দানের শাহাদাতের মওত নসীব করেন। আমিও সেমতে দু'আ করেছি। পাশাপাশি এই দু'আও করেছি, রাব্বে কারীম যেন, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের জন্য যা কল্যাণকর, সেটাই তোমার জন্য ফয়সালা করেন। তুমি ফিরে এসেছ, আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দিয়ে বিশেষ কাজ নেবেন। প্রতিমা-রুবাবার জন্য মন খারাপ করে থেকে নিজের স্বাভাবিক চলনবলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।
-আল্লাহর ফয়সালার উপর কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।
-প্রতিমা প্রথম প্রথম ভেঙে পড়লেও, কিছুদিন পর মানসিক আঘাত সামলে উঠল। পাকিস্তান থেকে তোমার চিঠি এলে, খুব খুশি হত। তুমি বেঁচে আছো, এটাই তার জন্য বিরাট সান্ত¡নার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। তোমার দাদু আর আম্মুর সাথে পরামর্শ করে, প্রতিমাকে বিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেছিলাম। প্রতিমার প্রবল অনীহা দেখে, আমরা পিছিয়ে এসেছি। তোমার জন্য এভাবে প্রতীক্ষা করে বসে থাকা, আমার কাছে যৌক্তিক মনে হল না। আমাদের কাছে কষ্টেরও ছিল। তুমি ফিরবে কি ফিরবে না, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। আমি অভিভাবক হয়ে, কিভাবে একটা মেয়েকে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখতে পারি? এটা গুনাহ হবে না? তাই বিবেকের তাড়নাতেই, আরও কয়েকবার প্রতিমার বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিবারই সে প্রচ-ভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তারপর আর পীড়াপীড়ি করিনি।
-প্রতিমা ইন্ডিয়া কোথায় আছে, সেটা জানিয়েছে?
-চিঠি লিখেছিল একটা। এদিক থেকে চিঠি দিতে নিষেধ করেছে। চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছে কলকাতার। দেখে নিও।
-প্রতিমাকে নেয়ার জন্য এই একবারই এসেছিল ওপার থেকে?
-না, এনিয়েও ঝামেলা কম হয়নি। চারবার এসেছিল। প্রথম প্রথম ওকে নিতে আসাটা তাদের দূরভিসন্ধি মনে হলেও, পরের দিকে আমার মনে হয়েছে, ওরা আসলেই

প্রতিমাকে ভালোবাসে। প্রতিমার মা-বাবা ছাড়া বাকি সব আত্মীয়-স্বজনই জীবিত। প্রতিমার ছোট ভাইও জীবিত। সেও চায়, বোন ওপারে চলে যাক। কিন্তু প্রতিমার এককথা। আমাদের সাথেই ও জীবন কাটিয়ে দেবে। তুমি না ফিরলে, আমাদের পারিবারিক স্কুলে পড়ানোকে জীবনের মূলব্রত হিশেবে গ্রহণ করবে। যে স্কুলে তার পড়াশোনা, সে স্কুলে শিক্ষকতা করে একটা জীবন পার করে দেয়া, কম কথা নয়।

.

দাদাজির সাথে কথা বলতে বলতে কবরস্তানের দিকে যাচ্ছিলাম। দাদাজির প্রতিদিনের রুটিন। ইশরাক পড়ে ঘরে ফেরার পথে একবার কবরস্তানে যাবেন। পূর্বপুরুষের কবর যেয়ারত করবেন। আজও ব্যতিক্রম হল না। দাদাজি বলেন, সবারই নিয়মিত কবরস্তানে আসা উচিত। মৃত্যুর স্মরণ করতে সহজ হয়। সারাদিন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন হয়। মন নরম হয়। আখেরাতের কথা মনে আসে। পূর্বপুরুষের জন্য দু‘আ করা হয়। দাদাজি বললেন,

-আজ এক জায়গায় নিয়ে যাবো। এখন চলো, দাদু আর আম্মুর সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাও। কত কাজ যে আছে, তোমাকে সাথে নিয়ে করার।

-আজ কোথায় যাবেন?

-সেই পুরনো কাজ, ‘ইশকুল-মফিল’-এ।

.

ইশকুল-মফিল, দাদাজির আরও একটি চমৎকার কাজ। আশেপাশের প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুলে দাদাজি প্রতি মাসে নিয়ম করে হাজিরা দেন। প্রধান শিক্ষককে বলেকয়ে, ছাত্রদের থেকে একটু সময় নেন। তাদেরকে গল্পচ্ছলে দ্বীনের কথা বলেন। ছাত্ররাও দাদাজিকে খুবই পছন্দ করে। যেদিন দাদাজি স্কুলে আসেন, ছাত্র-ছাত্রীরা খুশিতে ডগমগ হয়ে যায়। দাদাজি প্রায়ই সাথে করে চকলেট নিয়ে আসেন। ঢাকা গেলে, ভালোমানের অনেক চকলেট নিয়ে আসেন। ছাত্র-ছাত্রীরা দাদাজির নামই দিয়েছে ‘চকলেটদাদু’। শুধু ছাত্রদের জন্যই নয়, শিক্ষকদের জন্যও সাধ্যানুযায়ী হাদিয়া নিয়ে যান। অজপাড়াগাঁয়ের শিক্ষক, অল্পকিছুতেই খুশি হয়ে যান। দাদাও বেছে বেছে সংসারের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি হাদিয়া দেন। সুন্দর একটা চামচ, একটা সুন্দর গ্লাস, একটা প্লেট এমন। ছাত্ররা সুন্দর করে নামাজ পড়ে দেখাতে পারলে, তাদেরকে চকলেটের বাইরে, আকর্ষণীয় পুরস্কারও দিতেন। অনেক সময় খেলার সামগ্রীও কিনে দিতেন। ছাত্ররা পুরস্কারের লোভেই নামাজের প্রতি খুবই যত œ বান হয়ে পড়ত। আমাদের গ্রামের মসজিদেও কোনও শিশু

মসজিদে এলে, দাদাজি পকেট থেকে চকলেট বের করে খেতে দিতেন। চকলেট সবসময় তার পকেটেই থাকত।

.

দাদাজির আরেকটি মেহনতের কথা না বললেই নয়। আগে বলেছিলাম, বিভিন্ন পেশাজীবী অভিজ্ঞ শিল্পীদের জীবন ইশকুলে শিক্ষক নিয়োগ দিতেন। তাদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দাওয়াত দিয়ে জীবন ইশকুলে নিয়ে আসতেন। এর বাইরে যারা থাকত, তাদের কাছেও দাদাজি নিজে যেতেন। প্রতিটি পেশার কয়েকজনকে একত্র করে, তাদের পেশার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলতেন। তাদের পেশাগত উন্নতি বিষয়ে শলা-পরামর্শ করতেন। ফাঁকে ফাঁকে দ্বীনের কথাও শুনিয়ে দিতেন।

.

দাদাজি বোধ হয় আম্মু আর দাদুকে বলে দিয়েছিলেন, আমাকে যেন রুবাবা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন না করে। তারা দু'জন এ-ব্যাপারে আমার কাছে কিছুই জানতে চাননি। এমনকি প্রতিমা সম্পর্কেও কথা তুললেন না। এমনি শুয়েবসে কিছুদিন কাটল। অযথা সময় ব্যয় হল যে এমন নয়। দাদাজির সাথে বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে হয়েছে। জীবন ইশকুলে সময় দিয়ে হয়েছে। মোটামুটি বেড়ানো শেষ হওয়ার পর, দাদাজি বললেন,
-তুমি কি একবার তোমার শাশুড়িকে দেখে আসবে? আসলাম বলেছিল, যদি সম্ভব হয়, তার ভাগের কোনও জমি বিক্রি করে, কিছু টাকা যেন লুবাবার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করি।
-দাদাজি, খুবই ভাল চিন্তা। আমারও ভারতে একটু দরকার আছে।
-প্রতিমাকে খুঁজতে যাবে?
-জি¦ না, মূলকারণটা প্রতিমা নয়। আমাকে দিল্লিতে কিছু লোকের সাথে দেখা করে, কিছু সংবাদ পৌঁছাতে হবে। আফগানিস্তান থেকে আমাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
-তাহলে তো কথাই নেই। আমি লুবাবার জন্য বেশ কিছু টাকা যোগাড় করে রেখেছি। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রওয়ানা হয়ে যাও। প্রতিমার ঠিকানাও তোমাকে দিয়ে দেব। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।
-আমীন।

দিনলিপি-১৪৮৮
(২৪-১১-১৮)
দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (৮)!
-
নতুন করে পাসপোর্ট করা হল। দাদাজির পরিচিতজনের সূত্রে সহজেই ভিসা হয়ে গেল। ঢাকায় কিছু দরকার ছিল। সেগুলো সেরে তারপর ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আফগান থেকে ফেরার দিন সরাসরি বিমানবন্দর থেকে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। ঢাকায় কোথাও যাইনি। বিমানবন্দর স্টেশন থেকেই ট্রেনে উঠে গিয়েছিলাম। কখন বাড়ি যাব, সে তাড়নায় মন বেচাইন ছিল। এবার ধীরেসুস্থে সবখানে যাওয়া যাবে। ওস্তাদগনের সাথে দেখা করতে হবে। ছাত্রজীবনের সঙ্গী, আফগানের রণাঙ্গণফেরত সাথীদের সাথেও কথা বলতে হবে। কাম কম নয়। ঢাকায় আমাদের স্থাবর-অস্থাবর কি কি আছে, সেগুলো দাদাজির দেয়া তালিকামতে চিনে যেতে হবে। এক-দু'দিনে হবে না। কয়েকদিন লেগে যাবে। একটি পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করার জোরদার প্রয়াস চালাতে হবে। জাগো মুজাহিদ নামে বের হবে পত্রিকাটি।
.
কলকাতার ঠিকানায় গিয়ে প্রতিমাকে পাওয়া গেল না। সে তার দাদীর সাথে কাশি গেছে। সেখানে কিছুদিন থাকবে। এবার দোটানায় পড়ে গেলাম। কাশি আগে যাবো নাকি, দিল্লী আগে যাবো? দিল্লিতে যাদের সাথে দেখা করার কথা, তাদের দেখা না পেলে, কাশ্মীর পর্যন্ত দৌড়ানো লাগতে পারে। কাজটা মূলত কাশ্মীরে।
.
সবদিক বিবেচনা করে ঠিক করলাম আগে হায়দ্রাবাদ যাবো। সাথে এত টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করা নিরাপদ নয়। লুবাবা চাচী, চরম আর্থিক অনটনে আছেন। তার কাছে টাকাটা পৌঁছানো জরুরী। চাচীর কাছে মায়ের আদর পেয়েছি। ঢাকায় থাকাকালে আমাকে সন্তানের মতো আগলে রেখেছিলেন। পরম বন্ধুর মতো সঙ্গ দিয়েছিলেন। হাতেকলমে ধরে ধরে জীবনের নানারঙের পাঠ দিয়েছিলেন। যেসব পরিবেশে আমার যাওয়ার কথা ছিল না, সুযোগ ছিল না, সেখানেও চাচীর হাত ধরে অনায়াসে চলে গেছি। জীবন অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।
হায়দ্রাবাদের প্রাচীন এলাকায় চাচীর বসতবাড়ি। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বড় একটা বাড়িতে অসংখ্য পরিবার গাদাগাদি করে বাস করছে। আমাকে নিয়ে যৌথ

বৈঠকখানায় বসানো হল। বসতে না বসতেই, চারদিক থেকে পিলপিল করে অসংখ্য নানাবয়েসী ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। আমি যেন মৌচাক, ওরা মৌমাছি। কোনও বাড়িতে এতগুলো ছোট ছেলেমেয়ে থাকতে পারে, কল্পনাও করতে পারিনি। দরজার ফাঁক দিয়ে, জানলার শার্সি দিয়ে, হাজারবর্ষী দেয়ালের ফোকর দিয়ে, কেউ উঁকি দিচ্ছে। কেউ জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। কেউ ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে। মা শা আল্লাহ! রুবাবার মামারা বেশ ভালোই ঘর-সংসার করছে দেখছি। একেবারে জমিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন উঁকি দিয়ে তৃপ্তি পেল না বোধ হয়, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসত লাগল। একপা এগোয়, একটু থামকায়। বোঝার চেষ্টা করছে, তাদের শিকার কতটা হিংস্র। পরখ করার পর যখন দেখল, এদিক থেকে কোনও লড়চড় নেই, তখন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, বহুদিন পর তারা একটা গোবেচারা নিরীহ শিকার পেয়েছে। সহজেই ঘাড় মটকানো যাবে। একটা পুতুল-পুতুল মেয়েই সেনাপতির ভূমিকা নিল। জানতে চাইল,

-তুম কোনও হো? কাহাঁ সে আয়ে হো? কিসকি পাস আয়ে হো?

সমানে প্রশ্ন করেই যাচ্ছে! একশ একটা প্রশ্ন কর তরে ক্ষান্ত হল। কোনও ছেড়ে কোনটার উত্তর দেই। এত প্রশ্নের তোড়ে প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল, সেটাই ভুলে গেল। সেনাপতিনীকে বুকচিতিয়ে প্রশ্ন করতে দেখে, এবার অন্যরাও শুরু করল প্রশ্ন। দুনিয়ার এমন কোনও বিষয় নেই, তারা প্রশ্ন করেনি। তাদের কেউ উত্তরের অপেক্ষা করছে না।

.

চাচি এলেন। আমাকে দেখে তিনি রীতিমতো আকাশ থেকে পড়লেন। বিশ^াসই করতে পারছিলেন না, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলাম। হাত ধরে এনে সামনের আসনে বসালাম। চাচী সেই এখনো প্রায় আগের মতোই আছেন। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন, এছাড়া বাকি সব ঠিক আছে। বয়েসের সাথে সাথে চাচীর আভিজাত্য আরও বেড়েছে। এমন মানুষের উপর কী কঠিন পরীক্ষা নেমে এসেছে! টাকাটা তার হাতে তুল দিলাম। কিছুতেই টাকা নিবেন না। অনেক জোর খাটাতে হল। বললাম, এটা চাচারই টাকা। তিনিই আপনাকে দিতে বলেছেন।

.

ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। দেশে যাওয়ার আগে আবার আসার ওয়াদা করে তবেই ছাড়া পেলাম। চাচার সাথে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ হয়। রুবাবার সাথেও। পাকিস্তান যাওয়ার আশা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একটা উপায় বের হয়েছে।

দেখা যাক, তারপরও সহসা হবে বলে মনে হয় না। আসার সময় চাচি মেয়ের হয়ে, ক্ষমা চাইলেন,

-ক্ষমা কেন চাইবেন? এই ঘটনায় আমাদের কারও হাত ছিল না। রুবাবা আর আমি পরিস্থিতির শিকার।

-তারপরও আমার কিছুটা দায় আছে বলে মনে হয়। এজন্য মনে মনে অপরাধবোধ ভুগি। আমিই জোর করে রুবাবাকে ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। সে যে কোনও মূল্যে তোমার কাছে যেতে চেয়েছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে সরাসরি আমাকে বলেও ফেলেছিল সে কথা। আমি আর তোমার চাচাজি মনে করেছিলাম, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে, তোমার সাথে দেখা হবেই।

-আমার আজ এনিয়ে কোনও ক্ষোভ নেই। আল্লাহরই ফয়সালা। আমি বান্দা হিশেবে মেনে নিতে বাধ্য। আপনি মনে কোনও প্রকার কষ্ট রাখবেন না। আমাকে আগে যেমন সন্তানের মতো দেখেছেন, এখনো তেমন দেখলে আমার ভালো লাগবে। রুবাবার সাথে ঘরা আমার নসীবে জোটেনি। কিন্তু রুবাবার সূত্রেই আপনি আমার 'মা' হয়ে গেছেন। আগেও মা-ই ছিলেন। বিয়ের পর শরীয়তসম্মত হয়েছে 'মায়ের' ভূমিকা। আর আপনি আর্থিক বিষয়ে একটুও চিন্তা করবেন না। আর আপনি যদি 'মুনাসেব' মনে করেন, আমাদের বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারবেন। দাদাজি বলেছেন, আপনাকে তার জীবন ইশকুলে শিক্ষকতার চাকরি দেবেন। যথাযথ সম্মানীও দিবেন। আর এখানে থাকলে, চাচার সম্পত্তি থেকে আয়ের একটা অংশ আপনার জন্য পাঠিয়ে দেবেন নিয়মিত।

.

এবার তীর্থনগরী কাশিতে যেতে হবে। কড়া মুসলিম বেশে ওই শহরে যাওয়া নিরাপদ নয়। কলকাতা থেকে কৌশলে প্রতিমার সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম। তবে সুনির্দিষ্ট ঠিকানা সংগ্রহ করা যায়নি। বাঙালিটোলার এক গলিতেই প্রতিমার বুড়ি দাদীর নিবাস। সরাসরি নিজে গিয়ে উপস্থিত হলে, ঝামেলা হতে পারত। মোগলসরাই স্টেশনে ট্রেন থেকে কাশির বাসে চড়ে বসলাম। বেশভূষায় একজন হিন্দু সাধকের মতোই লাগছে। বাড়তি খাতিরযত্ন জুটছে। দাঁড়ি-গোঁফ আর হাতে বাঁকা লাঠি গেরুয়া বসন, কাঁধে ঝোলা, হাতে রুক্ষাদ্রের জপমালা, আর কি চাই। কাশী গিয়ে দশাশ^মেধ ঘাটের কাছে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম। এখন সকাল, রাত নামুক, তখন সস্তার হোটেল দেখে, রাতযাপনের বন্দোবস্ত করা যাবে। নামাজের কী ব্যবস্থা করা যায়? আচ্ছা, জোহরের সময় হলেই হোটেল ঠিক করে ফেলতে হবে। ভীড় পাতলা দেখে একপাশে চুপচাপ বসে থাকলাম। শ'য়ে শ'য়ে তীর্থযাত্রী আসছে

গঙ্গস্নানে। নারী-পুরুষ একসাথে। কিছুক্ষণ পর মনে হল, বিশ্বনাথ মন্দিরের আশপাশও একটু ঘুরে আসা দরকার। ওদিকে পা বাড়ালাম।

.

বাঙালিটোলা বের করাও মুশকিল হয়ে পড়ল। কাশীতে যত অলি গলি তস্য গলি অন্ধ গলি ভুতের গলি আছে, বিশে^র আর কোনও শহরে আছে কি না সন্দেহ। হতাশ না হলে, হাল না ছেড়ে গলির একপাশ থেকে খোঁজ শুরু করলাম। প্রথম দিন বের হল না। কাশীর গলিতে, বিশ^নাথ মন্দিরের মুখে ছোট ছোট ছেলেরা নানা ধান্ধায় ঘোরাঘুরি করে। তাদের কয়েকজনকে হাত করলাম। হোটেলে নিয়ে টাইটসে খাওয়ালাম। কোনও কাজ না দিয়ে, তাদের সাথে সম্পর্ক পাতালাম। যখন মনে হল, তারা অনুগত হয়ে এসেছে, তখন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। প্রতিমার নাম বললাম না। তাদেরকে শুধু বললাম, কলকাতার বাসার ঠিকানা আর বাঙলাদেশে আসল বাড়ির ঠিকানা। দেড়দিনের মাথায় মনোবাঞ্ছা পূরণ হল। সবচেয়ে চৌকশ স্যাঙাতের হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠালাম। আগামীকাল অতিভোরে, দশাশ^মেধ ঘাটের ডান পাশে। নিচে নামের জায়গায় লিখলামঃ জীবন ইশকুল। আশা করি প্রতিমা বুঝতে পারবে।

.

এবার প্রতীক্ষার পালা। সারারাত হোটেলে নামায পড়ে কাটল। জোরে কেরাত পড়া নিরাপদ নয় বিধায় তাহাজ্জুদে দাদাজির ফর্মূলা অনুসরণ করা গেল না। আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়েই ঘাটে চলে এলাম। এতভোরেও স্নানার্থীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। যারা অন্য পুরুষের সামনে ‘গঙ্গাজলে’ নামতে লজ্জাবোধ করেন, তারাই মূলত এই কাকভোরে চলে আসেন। বসে বসে যিকির করছি। লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা... পড়ছি। দুরূদ শরীফ পড়ছি। ইস্তেগফার পড়ছি। একটা কথা ভেবে বেশ মজা লাগল, এই পৌত্তলিকতার কেন্দ্রে বসে এভাবে কেউ যিকির করছিল আগে? দু‘আ করলাম, আল্লাহ তা‘আলা যেন এই শিরকের আখড়াকে তাওহীদের দুর্গে পরিণত করে দেন। উত্তেজনা বাড়ছে উত্তরোত্তর। মানুষের আনাগোনা বাড়ছে। তীক্ষè দৃষ্টিতে আগন্তুকদের অবয়ব দেখার চেষ্টা করছি। সাধুর পোশাক পরে নারীদের দিকে সরাসরি তাকানোও ঝামেলার, তাই বিভিন্ন দিকে তাকিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে।

.

ভোরের আলো ফুটে এল প্রায়। তাহলে কি প্রতিমা আসবে না? কোনও সমস্যা হয়েছে? অনিশ্চিয়তার দোলাচলে দুলতে দুলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। পেছন থেকে একদম কানের কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে ফিসফিস কথা অনুরণিত হল,

-আরেকজনকে খুঁজতে এসে ঘুমিয়ে পড়া ভালো লক্ষণ নয়!
আমি ভীষণ চমকে উঠে, অজান্তেই বলে উঠলাম,
-ননা না, আ-আমি ঘু-ঘুমুচ্ছিলাম না!
বাক্যটা বলে লজ্জা পেলাম। ছোট্ট শিশুর মতো আচরণ কর ফেলেছি। বেকায়দায় পড়ে, ছেলেবেলার জন্মগত তোতলামিও ভর করেছে। দাদাজির 'তাহাজ্জুদ' ফর্মুলার ফল একটু সময়ের জন্য 'বিফল' হয়ে গিয়েছে। এভাবে আড়ালে লুকিয়ে থেকে, আচানক 'হুয়া' করে উঠে ভয় দেখানোর মতো, কানের কাছে কথা বলে উঠলে, সাময়িক 'ভারসাম্য' হারানোরই কথা। বিব্রতভাব সামলে নিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখি, চোখমুখ ঢেকে চিকন লম্বা ঘোমটা টানা প্রতিমা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। মুখে হাতচাপা দিয়েও হাসি থামাতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসেই পড়েছে। আশ্চর্য তো, এই মেয়ে এত হাসছে কেন? পিঠ দুলে দুলে উঠছে। বসে বসেই দ্বিতীয় বুলেট হাঁকাল, রীতিমতো নিরীহ ভঙ্গিতে ফুট কাটল,
-শুনেছি আফগানিস্তানে পাহাড়-জঙ্গল দাবড়ে তাবড় তাবড় 'রাশান' ভাল্লুকের দফরফা করেছেন, তাহলে কি সেসব ভুল শুনেছি? বাব্বাহ! কী ভয়টাই না পেয়েছে!
.
সেদিনের পুঁচকে মেয়ে আজ বড় তিড়িংবিড়িং করে কথা বলছে! রীতিমতো ভড়কে দিয়েছে। আমারই ভুল ছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, প্রতিমা আসবে, আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য রেখে তার কাছে গিয়ে আস্তে করে নিজের পরিচয় বলব। শিকারীই যে উল্টো শিকারে পরিণত হবে, এটা কে ভেবেছিল? আর প্রতিমা এমন দুষ্টুমি করবে, এটাও মাথায় ছিল না। যাক সামলে নিয়ে তাড়া দিয়ে বললাম,
-হয়েছে যাও, আমি ভীতু! খুশি? দয়া করে উঠে দাঁড়াও। লোকজন তাকাচ্ছে। একজন সাধুর সামনে একটি ঘোমটা পরা নারী হাসতে, দৃশ্যটা অনেকের কাছেই উপাদেয় লাগবে।
-আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত! সত্যি করে বলছি, ভুল হয়েছে। চিরকুটটা পাওয়ার পর থেকেই মনে হয়েছে, আমি আকাশে উড়ছি। কী এক বাঁধভাঙা আনন্দ তনুমনে তরঙ্গের মতো ছলকে ছলকে উঠছিল। আল্লাহর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসছিল বারবার। খবরটা শোনার পর সেই যে জায়নামাজে গিয়েছি, ওজু-খাওয়া ছাড়া অন্য কাজ করিনি। সারারাতও নামাজ আর তিলাওয়াতে কাটিয়েছি। আমার মানত ছিল, আল্লাহ তা'আলা যদি জীবনে একটিবারের জন্যেও আপনার দেখা মিলিয়ে দেন, আমি চব্বিশ ঘণ্টা নামাজ ও তিলাওয়াত করে কাটাব। সেই মানতই নগদে পুরো করার চেষ্টা করলাম।

-তোমার দাদু কিছু বলেননি? তার সাথে থেকে মুসলমানের নামাজ পড়ছ?
-জি¦ না। দাদু অনেক অনেক ভালো। দাদু আগে থেকেই সব জানতেন। গত কয়েকমাসে আরও ভালো করে জেনেছেন। সেসব বিরাট কাহিনী। পরে বলব। আপনার কথা বলুন।
-কথা বলার সময় অনেক পাওয়া যাবে,ইনশাআল্লাহ। চলো হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।
-তাহলে দাদুর ঘরে চলুন। তিনি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।
-কয়েকটা কথা বলে নিই?
-জি¦।
-ভূমিকা না করে, মূলকথা বলে ফেলি। আমার সবকথা তুমি শুনেছ। নতুন যা জানানোর তা হল...
-রুবাবা আপুর পরে আবার বিয়ে হওয়ার ব্যাপারটাতো?
-জি¦, তুমি কিভাবে তার দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানলে?
-কেন, রুবাবা আপুর প্রথম বিয়ের কথা যার কাছে জেনেছি, তার কাছে? অবাক হয়েছিলাম, দুলাভাই আমাদের ঘরের মানুষ হওয়ার পরও বিয়ের খবরটা পেলাম না। পেলাম অনেক পরে, দাদাজির কাছে। নাহ, এনিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই।
-তোমরা মেয়েদের এই এক ব্যাপার! খোঁচা-টিপ্পনী যা দেয়ার সেটা ঠিকই দিয়ে দেবে, পরে বেড়ালের মতো জিভ দিয়ে মুখ চেটে তাওবা করে সাধু সাজবে। উল্টো জবাব দিতে গেলে ফাঁৎ করে জ¦লে উঠবে নয়তো ভ্যাঁএ করে কেঁদে দিবে। তোমাকে দু'টি কথা বলছি, মনযোগ দিয়ে শোন!
ক: আজ, এখনই যদি বিয়েটা সেরে ফেলি, তাতে কোনও আপত্তি আছে? বিয়ের ছেলে-মেয়ে পরস্পরে, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা-দেখাসাক্ষাত হারাম। তাই এত তাড়াহুড়া!
খ: প্রথম কথার উত্তরে হাঁ বা না বলার আগে, একথাও জেনে রাখা আবশ্যক। আমি যে কোনও সময় (সেটা বিয়ের পরও হতে পারে) আবার ময়দানের মেহনতে শরীক হতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। তুমি চিন্তাভাবনা করে মত দাও।
-চিন্তার কিছু নেই। আর কত চিন্তা করব। চিন্তা করতে করতে বুড়িয়ে যাচ্ছি। চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন। আমার সব চিন্তার ভার এখন থেকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। সেই ছেলেবেলাতেই দিয়েছিলাম। আপনি ভার গ্রহণ করেননি! অথবা করতে চাননি!
-আহা, খালি অভিমান আর অভিমান! চলো, অনেকদূর হাঁটতে হবে। শহরের আরেকপ্রান্তে যেতে হবে। ওখানে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। ফিরতে দেরী দেখে, তোমার দাদু দুশ্চিন্তা করবেন না?

-একদিন করুক না। কিছু করার নেই। তিনি জানেন, আমি সবসময় তার সাথে থাকব না। একদিন ফিরে যাবো! তার মানসিক প্রস্তুতি দাদুর আছে।
-কোথায় ফিরে যাবে বলেছ?
-কেন আমার বাড়িতে? আর এই পোশাকেই চলে যাব?
-যেভাবে ঘোমটা দিয়ে আছ, তাতে সমস্যা হবে না। পোশাকের ব্যবস্থা আছে। তুমি আমার থেকে একটু দূরে দূরে থেকে হাঁটতে থাকো। আমি হোটেলে গিয়ে একটু পোশাক বদলে আসব। তুমি কষ্ট করে একটু বাইরে দাঁড়াবে।
.
বিয়ের পর মনে হল, অনেক অনেক বড় কিছু অর্জন করে ফেলেছি। অমূল্য এক সম্পদের মালিক বনে গেছি। একটু আগে যে মেয়েটি হারাম ছিল, একটি বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে মেয়েটি আমার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসা বিশুদ্ধতম পানির চেয়েও হালাল সুপেয় সুমিষ্ট হয়ে গেছে। ফুলের মতো পবিত্র হয়ে গেছে। আল্লাহর শরীয়তই আমাকে এই নেয়ামতে বিভূষিত করেছে। অবাক হলাম, বিয়ের আগে যে মেয়ে পুরো রাস্তায় অনবরত কথা বলে আমার কানের পোকা মেরে ফেলেছে, সে মেয়েই বিয়ের পর কেন যেন, একেবারে ভ্যাবলার মতো হয়ে গেছে। একদম চুপচাপ। ইমাম সাহেবের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যখন ফাতিমার হাত ধরলাম, সে থরথর করে কেঁপে উঠল। কেন কাঁদল? যে মেয়ে শেষরাতের আলো-আঁধারিতে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল, সে মেয়েই এখন কাঁন্নায় ভেঙে পড়ছে। বাধ্য হয়ে ইমাম সাহেবের ঘরে আরেকটু বসে আসতে হল। হুজুর, না খাইয়ে ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু বেশি দেরী হলে, দাদু দুশ্চিন্তা করবেন, তাই জোর করে ছুটে আসতে হল। সেদিন দু’জনে পুরো কাশি শহর চষে ফেললাম। এত কথা জমে ছিল দু’জনের মধ্যে অবাক হলাম! কিভাবে কথাটা বলব, বুঝতে পারছিলাম না, আমাকে ইতঃস্তত করতে দেখে, ফাতিমা বুঝে ফেলল, আমি কিছু বলতে চেয়েও বলে উঠতে পারছি না,
-আপনি কি এমন কিছু বলতে চাইছেন, সংকোচের কারণে বলতে পারছেন না?
-না মানে ফাতিমা বলছিলাম কি...!
-আমার কাছে কোনও কথা বলতে আপনাকে ইতস্তত করতে হচ্ছে, এটা আমার জন্য কী যে কষ্টকর..!
-ঠিক আছে বলছি! ফাতিমা! আমাকে একটু কাশ্মীর যেতে হবে!
-ও, আপনি আমাকে নিতে আসেননি?

-ফাতু! ভুল বোঝনা! তুমি আমার কাছে যে কী, সেটা তোমাকে কী করে বোঝাই বল দেখি? কিভাবে বললে, তুমি আশ^স্ত হবে? তুমি কাশ্মীর না গেলে?
-না না, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি কখনো আপনার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আপনি আফগানিস্তানে গিয়েছেন। আমি প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝিনি। দাদাজি বুঝিয়ে দেয়ার পর থেকে, গর্বে আমার বুক ফুলে উঠতো!
-তা তো ছিলই!
-ধ্যেৎ! সিরিয়াস কথার মধ্যেই যে আপনি রসিকতা নিয়ে আসেন, সেটা নিয়ে আমরা কিছু বলব না। আমরা একটু অভিমান করলেই পুরো মেয়েজাতির গোষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়েন!
-আচ্ছা আচ্ছা! ভুল হয়েছে! 'তা ছিল না', ঠিক আছে?
-আবারো? ভালো হবে না বলছি!
-কী মুশকিল! আগে হাঁটলেও বিপদ, পিছনে হাঁটলেও বিপদ। কোনদিকে যাই!
-পাশাপাশি হাঁটুন! বাকী জীবন! কখনো আমাকে কাছছাড়া করবেন না, এমনকি কাশ্মীরে গেলেও সাথে নিয়ে যাবেন! দুনিয়ার শেষমাথা পর্যন্ত আমরা একসাথে হাঁটব। জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। ব্যতিক্রম কিছু হলে একদম মানব না। জান্নাতে গেলেও একসাথে যেতে চাই। ঠিক আছে?

দিনলিপি-১৪৯১
(২৭-১১-১৮)
দ্বিখণ্ডিত ভালবাসা (৯)
রুবাবা!
-
মানুষ ভাবে এক আর হয়ে যায় আরেক। জীবন নিয়ে কত রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম! ওস্তাদজিকে নিয়ে জীবনটা কিভাবে কাটাবো, সেটা নিয়ে অহর্নিশি সুখচিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলাম। বলতে লজ্জা নেই, ওস্তাদজিকে প্রথমবার দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল। সে ভালো লাগাটা একটি নিষ্পাপ শিশুর আরেক শিশুর প্রতি ভালো লাগা। আমি ঘরে একা থাকতাম। খেলার সাথী ছিল না। আম্মু ছাড়া ঘরে আর কোনও মানুষ ছিল না। আব্বুকে সবসময় পাশ পেতাম না। পাওয়ার কথাও নয়। কাছাকাছি বয়েসের

ওস্তাদজি যখন প্রথমদিন বেড়াতে এলেন, আমি দূর থেকে বারবার দেখতে লাগলাম। ভাবছিলাম কেমন হবে আমার খেলার সাথী? হায়দ্রাবাদে নানাবাড়িতে অনেক খেলার সাথী ছিল। তাদের সাথে বেশিদিন থাকতে পারিনি। ঢাকা চলে এসেছি। যাকে খেলার সাথী ভেবেছিলাম, তিনি আমার ওস্তাদজি বনে বসলেন। যিনি একসাথে খেলার সাথী আর শিক্ষার সাথী উভয়টাই ছিলেন। জীবনে যা কিছু সেরা অর্জন, প্রায় সবটার সাথেই আনাস উস্তাদজির কোনও কোনওভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি না থাকলে উর্দু শে'র শেখাটাও এমন মহব্বত-আকীদতের সাথে হতো কি না সন্দেহ। তাকে শোনানোর লোভেই আমি দিনরাত উর্দু শে'র-আশ'আর মুখস্থ করতাম। ওস্তাদজির উর্দু শে'র খুব বেশি আসত না। কিন্তু আমার কাছে শে'র শুনলে তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠত। মাঝেমধ্যে শে'র শুনে লজ্জায় লাল হয়ে যেতেন। এক বযমে মুশা'আরা থেকে ফিরে, পরদিন হিফযের পড়া শোনানো শেষ হওয়ার পর বলেছিলাম,

ইবতিদায়ে ইশক মেঁ রোতা হ্যায় কেয়া
আগে দেখখো হোতা হ্যায় কেয়া।
(প্রেমের শুরুতেই কাঁদতে বসেছ? দেখো সামনে আরও কত কী ঘটে)

ওস্তাদজি কেন যে এত শরমিন্দা হয়ে গেলেন, তখন বুঝতে পারিনি। অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ছোটবেলায় অনেক শে'রের মাফহুম (অর্থ) ভালো করে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু একবার শুনেই মুখস্থ হয়ে যেত, ওস্তাদজির সামনে বলে দিতাম। আমি না বুঝলেও ওস্তাদজি শে'রগুলোর অর্থ বুঝতে পারতেন। আমাদের যেদিন বিয়ে হল, ওস্তাদজি খুবই খুশি হয়ে বলেছিলেন,

-রুবাবা! আমার কী যে আনন্দ লাগছে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমি ভেবেছিলাম, ওস্তাদজির খুশিটা আমাদের বিয়ে হওয়ার কারণে। তারপরও অবাক হওয়ার ভান করে জানতে চাইলাম,

-এত খুশী 'কিঁউ'?

-তুমি এতদিন অনেক শে'র বলতে, অর্থটা তোমাকে ঠিকমত খুলে বলতে পারতাম না। এবার তুমি যে শে'রই বলবে, আমি তোমাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বুঝিয়ে দেব। সময়-সুযোগমতো হাতে-কলমেও।

ওস্তাদজি 'হাতে-কলমে' বলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, বুঝতে পারিনি। পরে লাহোরে এসে সেদিনের কথা ভাবতে বসে, অর্থটা বুঝতে পেরে আমার 'লাল' হওয়ার পালা। কিন্তু লাল হয়ে কি হবে, তিনি তো ততদিনে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছেন। তার সাথে কাটানো অসম্ভব সুন্দর কিছু স্মৃতিই আমার বেঁচে থাকার সম্বল ছিল,

ওহ্ ফিরাক আওর ওহ্ বিসাল কাহাঁ
ওহ্ শব ও রোজ ও মাহ ও সাল কাহাঁ?
সে-মিলন আর সে বিচ্ছেদ কোথায়?
সেই রাত, দিন, মাস, বৎসর কোথায়?
.
আম্মুর সাথে ফোনে কথা হল। কথা না হলেই বোধ হয় ভালো ছিল। কত আগ্রহ আর ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতে গেলাম। কথা বলার পর থেকেই মনোজগত ওলটপালট হয়ে গেছে। এতদিন যে মানুষটাকে মৃত জেনে এসেছি, তিনি নাকি জীবিত! এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে। আজও জানতে পারতাম না, মুখ ফস্কে আম্মুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলে জানতে পেরেছি। জানতে চাইলাম, দিনকাল কিভাবে চলছে, চিকিৎসা খরচ কিভাবে চলছে? আম্মু বললেন,
-আনাস কিছু টাকা দিয়ে গেছে।
আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। ভুল শুনলাম না তো? মামাবাড়ির কোনও আনাস হবে?
-আনাস? কোন আনাস আম্মু?
আম্মুকে ফোনের ওপ্রান্তে আমতা আমতা করতে দেখে, সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। জেরার মুখে, একে একে সব কথা খুলে বলতে বাধ্য হলেন। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আম্মুও এতদিন জানতেন না। জেনেছেন ওস্তাদজি (আনাস)-র কাছে। আব্বুর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি এলেন। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি ভীষণ চমকে উঠলেন। সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটল, সব বললেন। অনেক কষ্ট লাগল। তবে একটা ব্যাপার, আমাকে না জানানোর সিদ্ধান্তটা বোধ হয় ভালোই ছিল। আব্বু ও আবরারের আব্বু (দ্বিতীয় স্বামী)-র কোনও দোষ দেখলাম না। তারা ওস্তাদজির যথাসাধ্য খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দু'জনেই নিশ্চিতভাবে খবর পেয়েছিলেন, ওস্তাদজি মারা গেছেন। আবরারের আব্বু, পরে ভুল স্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বর্ণগুলো সরিয়েছিলেন বিশেষ বিপদে পড়ে, বাধ্য হয়ে তিনি অন্যায়টুকু করেছিলেন। নিজের জীবন বাঁচাতে একটি দলকে, মোটা অংকের টাকা দেয়ার অবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এটা ঠিক, আব্বুকে বললে, তিনি এমনিতেই দিয়ে দিতেন। আব্বুর কাছেও নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। ক্ষতিপূরণও দিতে চেয়েছেন। আব্বু কেন যেন গ্রহণ করেননি। আব্বু অর্থিকভাবে অনেক কষ্ট করেন, তবুও মেয়ে জামাইয়ের কাছ থেকে কোনও সাহায্য গ্রহণ করতে তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আমিও অনেক জোরাজুরি করেছিলাম। আব্বুর এক কথা।

.

আল্লাহ তা‘আলা আমাকে কখনো রুজি-রুটিতে কষ্টে রাখেননি। যতদিন আব্বুর কাছে ছিলাম, রাজকন্যার মতো রেখেছিলেন। মাঝের অল্পকিছু সময় আল্লাহ তা‘আলা পরীক্ষা নিয়েছেন। হিজরত করে লাহোরে আসার পর, আল্লাহর খাস ইচ্ছায় আব্বু নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তারপরও আব্বু আমাকে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ পোহাতে দেননি। আর বিয়ের পর তো খালিদ ভাইসাব (দ্বিতীয় স্বামী) রাজরানী করে রেখেছেন। প্রথম প্রথম তাকে পছন্দ হয়নি। না হওয়ার যৌক্তিক কারণও ছিল। কিন্তু আব্বুর কাছে ক্ষমা চেয়ে সব স্বর্ণ ফেরত দিতে চাওয়ার পর, মনের বিরূপ ভাব কেটে গেছে। যার সাথে ঘর করছি, যিনি আমার শরীয়তসম্মত শাওহার (স্বামী), তার অসম্মান করা গুনাহ। যা ঘটে গেছে, সেটা মনে পুষে রেখে, কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে হয় না। কিন্তু একটা ফোন এলোমেলো করে দিল,

‘‘জিন্দেগী ইউঁভি গুজরহি যাতি

কিঁউ তেরা রাহগুজার ইয়াদি আয়া’’!

‘‘জীবন তো এভাবেও কোনওমতে কেটে যেত,

তবু কেন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল?’’

কেন? জীবনটাকে তো একপ্রকার সামলে নিয়েছিলাম। আবার কেন খোদা তুমি পরীক্ষায় ফেললে? যে আগুন দাউদাউ জ¦লছিল, না নিভলেও ছাইয়ের নিচে চাপা পড়েছিল। এখন কিভাবে নিভাব,

ইশ্ক পর জোর নেহী হ্যায় ইয়েহ ওহ আতিশ রুবাব,

জু লাগায়ে নাহ লগে, আওর বুঝায়ে নাহ বুঝে।

‘‘প্রেমের উপর জোর খাটে না; এ সেই আগুন, রুবাব,

যা জ¦ালালে জ¦লে না, নেভাবে নেভে ন।’’

আল্লাহর কাছে দু‘আ করেই যাচ্ছি, তিনি যেন আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আগের জীবনে যাই হোক, মনের ঝোঁক যেমনই হোক, বর্তমান স্বামীর প্রতি যেন বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়। তার সাথে কোনও রকমের খেয়ানত না হয়। মনকে কোনওভাবেই মানাতে পারছি না। রীতিমতো যুদ্ধ করে করে মনকে দমিয়ে রাখতে হচ্ছে। শরীয়তসম্মতভাবেই যেহেতু দ্বিতীয় বিয়েটা হয়েছে, শরীয়তবিরোধী কিছু করে, পবিত্র সম্পর্কটাকে কলুষিত করতে চাই না। কিন্তু মন যে মানে না,

সো বার বন্দে-ইশক সে আযাদ হাম হুয়ে

পর কেয়া করীঁ কেহ দিল হী আদুউ হ্যায় ফিরাগ গা।

শতবার প্রেমের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হলাম

কিন্তু কী করি, হৃদয়ই মুক্তির পরিপন্থী।
.
আমি তো প্রতিজ্ঞা করেই নিয়েছিলাম। ওস্তাদজির অপেক্ষায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেব। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরও, আমার প্রতিজ্ঞায় কোনও ফাটল ধরেনি। শুধু আব্বুর হুকুমের সম্মান রক্ষার্থেই বিয়েতে রাজি হয়েছি। খালিদ ভাইসাব আশ^াস দিয়েছিলেন, আমি রাজি হলে, তিনি আম্মিজানকে লাহোরে এনে দেবেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মনের গভীরে কোথাও প্রতিজ্ঞাটি ঘাপটি মেরে ছিল। আম্মু বলেছেন, ওস্তাদজি আর বিয়ে করেননি। তাহলে এতগুলোর বছর কী করেছেন? তিনি কি কারো প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন? ছেলেবেলায় তাকে একটি শে'র শুনিয়েছিলাম। সেটাই যে চরম সত্যে পরিণত হবে, কে জানত,
ওহ জু হাম মেঁ তুম মেঁ কারার থা
তুমহেঁ ইয়াদ হো কেহ না ইয়াদ হো
সেই যে তোমার আমার মাঝে অঙ্গীকার ছিল,
তোমার স্মরণ আছে কি না জানি না, আমার আছে।
আহ, সেই দিন আর সেই মুহূর্ত! এতগুলো বছর পেরিয়েও একেবারে স্পর্শগন্ধসহ জীবন্ত হয়ে আছে স্মৃতিতে। ভুলি কী করে?
ফির কুচ এক দিল-কো বে-কারারী হ্যায়
সীনাহ জুয়ায়ে যখমকারী হ্যায়
আবার হৃদয় আমার অস্থির হয়ে উঠেছে
খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে, যার আঘাতে সে আবারও বিক্ষত হবে।
.
কল্পনাতেও ছিল না আমাদের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবে। ওস্তাদজির সাথে আমার পর্দা করা শুরু হয়ে গিয়েছে। আম্মু আগে থেকেই বলে আসছিলেন, আমি পর্দার বয়েসে পৌঁছে গেছি, এখন আর সরাসরি সামনে গিয়ে, ওস্তাদজির কাছে পড়া যাবে না। আম্মুর আদেশে অভ্যস্ত হতে সময় নিচ্ছিলাম। একটানা এতদিন ওস্তাদজির কাছে পড়ার পর, হঠাৎ করে নিজেকে আড়ালে নিয়ে যাওয়া, কঠিন ছিল। ওস্তাদজির কাছে পড়া মানে দু'জনে গল্প করা। এখন বুঝতে পারি, আমাদের আসল ওস্তাদ ছিলেন আম্মু। তিনিই আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতেন। আম্মুর পড়ানোর পদ্ধতিটা ছিল অদ্ভুত। আম্মু কোনও বই সামনে রেখে পড়াতেন না। সত্যি বলতে কি, আম্মু এমন কৌশলে পড়াতেন, সেটাকে পড়া বলেই মনে হত না। মনে হত ভাত খাওয়া, গোসল করা,

খেলাধূলা করার মতোই স্বাভাবিক নিত্যকর্ম বলে মনে হত। আম্মুর সাথে থেকে দু’জনে উর্দুতে বেশ ভালো হয়ে উঠেছিলাম। বিভিন্ন কিতাব কিনে আনতেন। দু’জনকে পড়তে দিতেন। প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব। পড়া শেষ হলে, বইদুটো অদলবদল করে দিতেন। দু’জনেরই কিতাবদু’টো শেষ হলে, দু’জনকে নিয়ে বসতেন, পঠিত বই নিয়ে গল্প করার জন্য। আম্মু বইদুটো আগেই পড়ে রেখেছেন। বইয়ের প্রতিটি লাইনই যেন আম্মুর চোখের সামনে ভাসত। তিনি বই না দেখেই বইয়ের বিভিন্ন লাইন নিয়ে কথা বলতে পারতেন। আমি আর ওস্তাদজি বইদুটো নিয়ে গল্প করতাম। আম্মু চুপচাপ শুনে যেতেন। ফাঁকে ফাঁকে বইসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করতেন। বইয়ের নির্দিষ্ট লাইনে ব্যাখ্যা শুনতেন। দু’জনের কাছ থেকেই। আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগত। এই পদ্ধতিতে সহজ-কঠিন মিলিয়ে বহু কিতাব পড়া হয়ে গিয়েছিল। উর্দু-ইংরেজি দুই ভাষাতেই। ওস্তাদজি অবশ্য বাংলাতেও অত্যন্ত ভালো ছিলেন। তার বেলামাসির কাছে বাংলাপাঠের দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমি উর্দু শে‘র বললে, ওস্তাদজি বাংলা কবিতা বলতেন। আমি ঠিকমতো বুঝতে পারতাম না। বুঝিয়ে দিতে বললে বলতেন, পরে বুঝিয়ে দেবেন। সেই পরে আর আসেনি। এসেছিল, বোঝানো শুরু করতে না করতেই বেলা ফুরিয়ে গেছে। বিয়ের পর ওস্তাদজি আমাকে ওস্তাদজি প্রথম সম্বোধন করেছিলেন, ‘মেরে দিলরুবা’ বলে। একটা শে‘র বলেছিলেন,

মেরে হাম-নাফাস, মেরে হাম-নাওয়া,
মুঝে দোস্ত বনকে দাগা না দে।
ওগো প্রাণ আমার, ওগা বন্ধু আমার!
মোরে বন্ধু হয়ে দাগা দিও না।

আমি বুঝিনি, কেন শে‘রটা বলেছিলেন। কী মনে বলেছিলেন? প্রশ্ন করতে গিয়েও করিনি। মনটা অজানা এক আশংকায় দুলে উঠেছিল। তাঁর হাতটা সজোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম। তিনি আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন,

ইশক কি হার দাস্তান মে এক হি নুকতা মিলা
ইশক কি মাজি হুয়া করতা হ্যায় মুসতাকবিল নেহি
‘‘ভালোবাসার প্রতিটি কাহিনীতে একটা ব্যাপারই চোখে পড়েছে,
ভালোবাসার অতীত থাকে, ভালোবাসায় ভবিষ্যত বলে কিছু নেই।’’

মেরে দিলরুবা! আমাদের ভালোবাসায় শুধু অতীত নয় ভবিষ্যতও থাকবে। আমরাই সুন্দর একটি ভবিষ্যত তৈরি করব, কেমন? তুমি আমি ছেলেবেলা থেকে কাছাকাছি থেকেছি, তবুও তুমি আমার হবে, আমি তোমার হবো, এটা কল্পনা করতে ভয় লাগত। তুমি আমার জীবনে অন্য নগমা হয়ে এসেছ,

তেরে আতে হি এ্যাই হাসীনা,
হার মওসম গোলাবি হো জায়ে
তেরে ভিগী হোঁট দেখ কর
গুলশান ভি খারাবি হো জায়ে
ইতনি নেশাহ হ্যায় তেরে ঝিল সি আঁখো মে আয় ইয়ারা
পিনেওয়ালো তো কেয়া, বোতল ভি শরাবি হো জায়ে।
তুমি আসতে না আসতেই, জীবন গোলাবরাঙা হয়ে গেছে,
তোমার সিক্ত অধর দেখে, ফুলকানন লাজন¤্র হয়ে গেছে
তোমার ঝিলনীল নয়ন দেখে, শরাবী তো বটেই, খোদ শরাবও মাতাল হয়ে গেছে।
.
আমি ওস্তাদজিকে শে‘রগুলো বলিনি। তাহলে তিনি কোত্থেকে শিখলেন? বড্ড কৌতূহল হয়েছিল। আমাকে তিনি কখনো এনমন শে‘রের নজরানা পেশ করবেন, কখনো ভাবিনি। তার এমন আবেগপূর্ণ গলায় ইনশাদ দেখে, আমি পড় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। কিছু বলতে পারছিলাম না,
বাত করনী মুঝে মুশকিল কভি
এয়সি তো না থে
জেয়সি আব হ্যায় তেরি
মেহফিল তো কভি এ্যায়সি তো না থে
‘‘কথা বলা কখনো এমন মুশকিল ছিল না।
আপনার মেহফিল তো কখনো এমন ছিল না?’’
ওস্তাদজির মুখে এমন সুন্দর সুন্দর শে‘র শুনতে কী যে ভালা লাগছিল, বলার নয়। তিনি কি তার কবিবিবিকে খুশি করার জন্য আলাদা করে শে‘র শিখেছেন? আমাকে নিয়ে তিনি আলাদা করে ভাবেন? বিয়ের দু’দিন পর আম্মু আমাদের দু’জনকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন পুরান ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে। বাড়িটা ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। আম্মু আমাদেরকে বাইরে ঘুরতে পাঠিয়েছিলেন। তখন সন্ধ্যা। বাইরে বের হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তবুও আম্মু আমাদের জন্যই বোধ হয় বেরিয়েছিলেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ নদীর তীরে বসেছিলাম। উনি কিছু বলছিলেন না। আমিও তার হাত ধরে চুপচাপ বসেছিলাম। উঠে আসার মুহূর্তে তিনি বলে উঠেছিলেন,
ইয়ে রাতেঁ ইয়ে মওসম নদী কা কিনারা ইয়ে চঞ্চল হাওয়া,
কাহা তো দিলুঁ নে কেহ মিল কর কভী হাম না হোঙ্গে জুদা!

“এই রাত, এই সময়, নদীর তীর, এই চঞ্চল হাওয়ায় বিমুগ্ধ হয়ে হৃদয় বলে উঠল, আমাদের এই মিলনের পর, আমরা কখনো ‘জুদা’ হবো না।”
তাঁর মুখে শে‘রটা শুনে চোখে পানি চলে এল। মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল,
ইয়ে হাওয়া, ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি
তেরে আদা পে নিসার হ্যায়
মুজে কিঁউ না হো তেরি আরজু,
তেরি জুসতুজু মে বাহার হ্যায়
এই হাওয়া, এই রাত, এই চাঁদনী
তোমার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক,
কেন তোমাকে পাওয়ার আরজু হবে আমার
তোমার সন্ধানের মাঝেই আছে চরমপ্রাপ্তি।
অনেক সময় এমন হয়, খুব আনন্দের মুহূর্তে, আচানক মন অজানা এক আশংকায় ভরে যায়। আমারও সেদিন এমন হয়েছিল। তিনিও কী বুঝে আমার হাত শক্ত করে ধরেছিলেন।

.

আম্মু অনেক ভালো শিক্ষক ছিলেন। নিঃশ^াস নেয়ার সময় যেমন অক্সিজেনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, আম্মুর শিক্ষাদানও ছিল অদৃশ্য বায়ুর মতো। প্রতিদিনই আম্মুর কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখতাম, কিন্তু সেটা টের পেতাম না। এটাই শিক্ষাদান করার শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। আয়োজন করে পাঠ্যবই হাতে নিয়ে শেখার মধ্যে, একধরনের কৃত্রিমতা থাকে। জোর করে জ্ঞানী হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। মনের উপর জোর খাটানোর ব্যাপার থাকে। আম্মুর পাঠদানের মধ্যে এসবের বালাই ছিল না।

.

আমি ওস্তাদজির কাছে কুরআন আর আরবি পড়তাম। আমি জীবনে চারজন শিক্ষক পেয়েছি। আব্বু-আম্মু, ওস্তাদজি আর ওস্তাদজির আব্বু। আরেকজন শিক্ষক পেয়েছিলাম মাত্র অল্প ক’দিনের জন্য। আমার ওস্তাদজির ‘দাদাজি’কে। মনে মনে কত কল্পনা করেছি, দাদাজির কাছে থাকব। ওস্তাদজির সাথে যখন বিয়ে হল, অনেক ভালো লাগা ভাবনার মধ্যে এটাও ছিল, এবার থেকে দাদাজিকে কাছে থেকে দেখতে পারব। ওস্তাদজির গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আমি ভীষণ অবাক। গ্রামে এতসুন্দর ঘরোয়া মাদরাসা! আম্মু যেভাবে কিতাবপত্র ছাড়া শিক্ষা দিতে চাইতেন, এখানে দাদাজিও প্রায় তার কাছাকাছি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

.
আম্মু প্রথাগত পরীক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। পরীক্ষা নিলে ছোটদের মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। তাদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। আম্মুর পাঠদান পদ্ধতিই এমন ছিল, পড়ার পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই যোগ্যতা যাচাই হয়ে যেত। কতদিন হল, আম্মুকে দেখি না। তাকদীরের আজীব এক ফয়সালায়, আমরা এভাবে ছিটকে পড়লাম। আচ্ছা, আমাদের কি কোনওদিন দেখা হবে না? আম্মুর সাথে থাকলে এতদিন আরও কতকিছু শিখে যেতাম। আম্মু বইয়ের চেয়ে জীবনের পাঠের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। ওস্তাদজির কাছে পেয়েছি কুরআন কারীম ও আরবী ভাষার পাঠ। আম্মুর কাছে পেয়েছি জীবনের পাঠ। সব মা-ই তার সন্তানকে বিশেষ করে কন্যাকে, জীবনের পাঠ দেন। আম্মুর পাঠ ছিল আরও বেশি কিছু।

.
আমাদের যেদিন বিয়ে হয়েছিল, তার পরদিন আম্মু দু'জনকে বসিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। বেশিরভাগ কথা বলেছেন ওস্তাদজিকে লক্ষ্য করে। আম্মু কোনও প্রতিষ্ঠানে না পড়লেও, জীবনে অনেক পড়াশোনা করেছেন। উর্দুসাহিত্যের প্রায় সব কবির দীওয়ান তার অনেকবার করে পড়া। উর্দুতে দ্বীনি যত কিতাব নাগালে ছিল, সেগুলোও আম্মু পড়েছেন। সীরাত, তারীখে ইসলাম খুব ভালোভাবে পড়েছেন। তিনি চাইতেন আমরাও তার মতো করে পড়ি। আমাদের দু'জনকে তিনি মনের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেদিন ওস্তাদজিকে বলেছিলেন,
-বেটা আনাস! আমি তোমাকে প্রথমবার দেখেই নিজের বেটা বলে গ্রহণ করে ফেলেছিলাম। আজ তুমি সত্যি সত্যি আমার বেটা হয়ে গেলে। আমি প্রথম দিন থেকেই তোমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেখিনি। আমার কলিজার দুই টুকরা ভেবে এসেছি। সেমতেই তোমাদের দু'জনকে তালীম দেয়ার চেষ্টা করেছি। তবে এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা হবে, এটা ধারনা করিনি। আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।

.
আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবার পরীক্ষায় ফেলেছেন। জীবনটাই একের পর এক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। আবরারের আব্বুকে কারা যেন গুলি করেছে। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার শত্রুর অভাব নেই। তিনি এমকিউএমের নেতা এবং বড় বড় ব্যবসার মালিক, অনেকেই তার পিছনে লেগে আছে। কারা গুলি করেছে এখনো বের হয়নি। কোনও চিকিৎসাতেই কিছু হচ্ছে না। হু হু করে টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। যাক, টাকাপয়সা যাবে আবার আসবে। কিন্তু মানুষটাকে বাঁচাতে হবে। আব্বু তার কাজকর্ম,

চাকরি-বাকরি ফেলে ভাতিজা-জামাইয়ের চিকিৎসার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন। একবার হাসপাতালে যাচ্ছেন আরেকবার মামলার পেছনে দৌড়াচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আমার নসীবে এবার কী লিখে রেখেছেন, তিনিই ভালো জানেন। মনটা সবদিক থেকেই বড় বিষন্ন। তিনি আমার জন্য যা-ই ফয়সালা করেন, আমি তাতেই খুশি! ওস্তাদজিকে বড় বেশি মনে পড়ছে।

উনকি আঁখু মে খুদা জানে কেয়া জাদু
কে তবীয়ত মেরি মায়েল কভি এ্যয়সে তো না থে।

.

ওহ পাস ৱাহে ইয়া দুৱ ৱাহে
নজৰুঁ মে সামায়ে ৱেহতে হেঁয়
এতনা তো বাতা কোয়ী হামে
কেয়া পেয়াৱ এসী কো কেহতে হেঁ

সমাপ্ত

শাইখ আতিক উল্লাহ হুজুরের লেখা গুলো-

৭৮। একটি সুন্নতকে বাঁচাবো বলে -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/85
৩৬৪। একটুখানি তাদাব্বুর -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/371
৩৬৫। কুরআনি ভাবনা -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/372
৩৮৭। আমাদের ইন্তিফাদা -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/394
৪৮২। দুজন দুজনার -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/489
৪৯৫। আই লাভ কুরআন -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/502

৫০০। আমার কুরআন কারিম -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/507
৫০৬। আন্দালুস হারানোর ৫২৭ বছর -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/513
৫৩১। আই লাভ ইউ -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/540
৬১২। ওগো, শুনছো! -শাইখ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/630
৬৮৭। গুরফাতাম মিন হায়াত (জীবন জাগার গল্প-১০) -মুহাম্মাদ আতিক উল্লাহ
https://t.me/islamicBooks500/711
৬৯৯। হুদহুদের দৃষ্টিপাত -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/726
৭২৯। আমি যদি পাখি হতাম -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/756
৭৩০। জীবনের ক্যানভাসে আঁকা গল্প -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/757
৭৪৪। নানারঙা রঙধনু -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/773
৭৭৪। জীবনের বিন্দু বিন্দু গল্প -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/812
৭৮১। কোঁচড় ভরা মান্না -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/820
৮০৯। ডানামেলা সালওয়া -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/852
৮২৩। গল্পের ক্যানভাসে আঁকা জীবন -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/866
৮৩২। খুলাসাতুল কুরআন (কুরআনের সারসংক্ষেপ) -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/876
৮৫৬। থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/900
৮৭১। আকাশের ঝিলিমিলি তারা -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/917
৯৪৯। সেপালকার ইন লাভ -শাইখ আতিক উল্লাহ-
https://t.me/islamicBooks500/1007

আসসালামু আলাইকুম
.
>> ইসলামিক বই, অডিও-ভিডিও লেকচার সিরিজ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের লিংকগুলো পাবেন এখানে
https://justpaste.it/48f6m
.
>> কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক বইয়ের (৫০০+) pdf লিংক
https://justpaste.it/4ne9o
.
>> Telegram Book Channel Link-
https://t.me/islamicBooks500
.
>> #Tasbeeh #Nusus এর গুরুত্বপূর্ণ সব সিরিজগুলো
https://justpaste.it/9c9jt
.
>> কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক Apps, YouTube Video, Quran Recitation, YouTube channel.
https://justpaste.it/islamicappvideo
.
>> রবের_কাছে_ফেরার_গল্পগুলো
https://justpaste.it/deen_a_ferar_golpo
.
>> "বিয়ে, রিজিক লাভ, ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি"
https://justpaste.it/5gol5
.
>> দাম্পত্যজীবন, অজ্ঞতা ও পরিণাম
https://justpaste.it/7u5es
.
>> বিবাহের কিছু আমল ও দু'আ এবং সুখী দাম্পত্যজীবনের জন্য ১০টি করণীয়, স্বামী ও স্ত্রীকে বশ করে রাখার টোটকা
https://justpaste.it/58k7y
.
>> দুআ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ লেখাসমূহ, দুআ কবুলের সময় শর্তাবলী ও আদবসমূহ, দুআ কবুলের গল্পগুলো
https://justpaste.it/7ttq6
.
>> দুশ্চিন্তা ও ডিপ্রেশন থেকে মুক্তির ১০ আমল
https://justpaste.it/8gmtk

.
>> র‍্যান্ড, মডারেট ইসলাম, মডার্নিস্ট মুভমেন্ট
https://justpaste.it/76iwz
.
>> ফেসবুক ও ইউটিউবের উপকারী সব পেইজ, গ্রুপ, আইডি এবং চ্যানেলের লিংক
https://justpaste.it/facebook_page_grp_link
.
>> তাকদির আগে থেকে নির্ধারিত হলে মানুষের বিচার হবে কেন? যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছেনি তাদের কী হবে?
https://justpaste.it/6q4c3
.
>> কখনও ঝরে যেও না ...
https://justpaste.it/3bt22
.
>> ফজরে আমি উঠতে পারি না
https://justpaste.it/6kjl6
.
>> এই ১০টি ফজিলতপূর্ণ আমল যা আপনার সারাবছরের_ই দৈনন্দিন রুটিনে থাকা উচিত
https://justpaste.it/9hhk1
.
>> ইস্তিগফার অপার সম্ভাবনার দ্বার
https://justpaste.it/6ddvr
.
>> বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণের ৭ টি উপায়; বিপদাপদে ধৈর্যধারণ: ফজিলত, অর্জনের উপায় ও করণীয়
https://justpaste.it/8dccj
.
>> মহান রবের আশ্রয়ে সিরিজের সকল পর্ব
https://justpaste.it/6ttuf
.
>> স্বার্থক মুনাজাত
https://justpaste.it/1xf0t
.
>> রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ-সংক্রান্ত ৭ পর্বের একটি সিরিজ
https://justpaste.it/4hhtd

.
>> তাহাজ্জুদ সিরিজ
https://justpaste.it/4ja0n
.
>> মহিমান্বিত কুরআন সিরিজের সকল পর্ব
https://justpaste.it/3dxi7
.
>> ধ্বংসাত্মক দৃষ্টি (বদ নজর সিরিজের সকল পর্ব)
https://justpaste.it/7056k
.
>> বিশুদ্ধ ঈমান সিরিজ
https://justpaste.it/7fh32
.
>> ইমান ভঙ্গের ১০ কারণ
https://justpaste.it/9icuq
.
>> পর্দায় প্রত্যাবতন: পর্দায় ফেরার গল্প
https://justpaste.it/3lqzf
.
>> নফসের জিহাদ -শায়খ আহমাদ মুসা জিবরীল (হাফিজাহুল্লাহ)
https://justpaste.it/8vnly
.
>> রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সকাল-সন্ধ্যার দু'আ ও যিকর
https://justpaste.it/sokalsondharjikir
.
>> সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক বাণী
https://justpaste.it/9e6qh
.
>> সন্তান লাভের ৭ টি গুরুত্বপূর্ণ আমল
https://justpaste.it/9hth5
.

>> Rain Drops, Baseera, Hunafa, Mubashshireen Media ও Ummah Network থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলোর (তাওহীদ সিরিজ, আকিদা সিরিজ, তাহাজ্জুদ, সালাত, আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ নিয়ে আলোচনা, ধূলিমলিন উপহার রামাদান, আলোর পথে যাত্রা, পরকালের পথে যাত্রা, শ্রেষ্ঠ মানুষেরা(নবীদের জীবনী), জীবন-মৃত্যু-জীবন, সীরাহ(রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী), কুরআনের কথা, কোরআনের বিভিন্ন সূরার তাফসীর, আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু, সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী, বোনদের প্রতি উপদেশ) অডিও ডাউনলোড লিংক
https://justpaste.it/4kes1

.

>> পাপ থেকে বাঁচার ১০ উপায়: যা সকল মুসলিমের জানা আবশ্যক
https://justpaste.it/3ob7j

.

>> রমজানের প্রস্তুতি : মুমিনের পথ ও পাথেয়
https://justpaste.it/5tziy

.

>> কাফির ও ইসলামের শত্রুদের মৃত্যু বা বিপদে আনন্দ প্রকাশ
https://justpaste.it/6ksvm

.

>> মহিমান্বিত রজনী (লাইলাতুল কদর) সিরিজ, লাইলাতুল কদরের জন্য ১২ টি সহজ আমল এবং ইতিকাফের গুরুত্ব, ফজিলত, উদ্দেশ্য, আমল।
https://justpaste.it/1q3bs

.

>> বিশেষ নফল নামাজ সিরিজ (ইশরাক, দোহা, চাশত, আওয়াবিন, যাওয়াল, সালাতুল হাজত, সালাতুত তাসবিহ, সালাতুল ইস্তিখারা, তাহিয়্যাতুল অজু, সালাতুত তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, সালাতুত তাওবাহ, সালাতুল কুসুফ)
https://justpaste.it/9n0kf

.

>> হাদিসের শিক্ষা সিরিজ
https://justpaste.it/4fywd

.

>> ইস্তিখারা সিরিজ
https://justpaste.it/2i736

.

>> আমাদের নবীজি (সাঃ) সিরিজ
https://justpaste.it/4c1tt

.

>> Words With Nusus সিরিজ
https://justpaste.it/6h968

.

>> বছরের শ্রেষ্ঠ দশ দিন (জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন)
https://justpaste.it/1s2vv

.

>> আশুরা দিবস : বাস্তবতা, পালনীয় ও বর্জনীয়
https://justpaste.it/3kn8w

.

>> সংশয় নিরসন সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/751n9

.

>> ইসলামিক বই, অডিও-ভিডিও লেকচার সিরিজ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের লিংকগুলো পাবেন এখানে। সবগুলো বিষয়ের লিংক এক জায়গায় রাখা হয়েছে। এই লিংকটা শেয়ার করতে পারেন।
https://justpaste.it/48f6m

.

>> কুরআন এবং আপনি
https://justpaste.it/5dds8

.

>> কুরআন কারীম নিয়ে আতীক উল্লাহ হুজুরের অসাধারন কিছু কথা ও উপদেশ
https://justpaste.it/8abde

.

>> হারাম সম্পর্ক, অবৈধ প্রেম, যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব
https://justpaste.it/8v591

.

>> বেদনায় সান্ত্বনা সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/4o94z

.

>> ভালো কিছুর সন্ধান সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/4yw8l

.

>> বন্ধন সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/5gz3q

.

>> আলোকিত রামাদান (Nusus)
https://justpaste.it/58wwu

.

>> ইতিকাফ সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/3l0u2

.

>> হৃদয়ের স্পন্দন সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/7k24b

.

>> কুরবানি সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/503e6

.

>> আল্লাহর মাস সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/84fg4

.

>> ইসলামিক উক্তি Islamic Quotes
https://justpaste.it/62c3k

.

>> ৩০০ টি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি বইয়ের তালিকা
https://justpaste.it/8qfvz

.

>> ইসলামে গণতন্ত্র ও নির্বাচন -তারেকুজ্জামান
https://justpaste.it/5hrq1

.

>> নির্ভেজাল ঈমান আকিদা সিরিজ (Nusus)
https://justpaste.it/9ou7w